নিজের ডাক্তার নিজে

নিজের ডাক্তার নিজে

পশুপতি ভট্টাচার্য —

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭
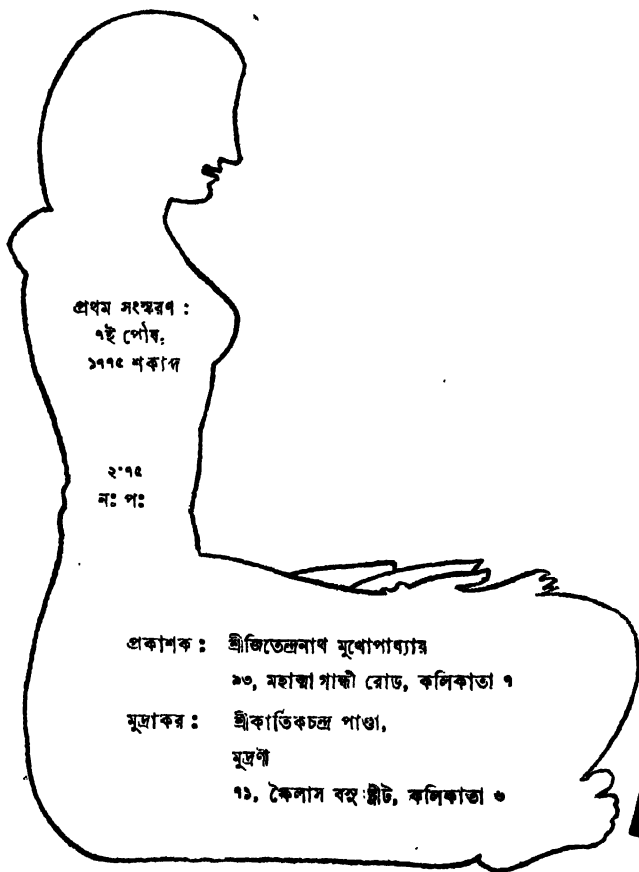
প্রথম সংস্করণ :
৭ই পৌষ,
১৭৭৫ শকাব্দ

২.৭৫
নঃ পঃ

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা,
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

বাংলা মা ও

তাঁর বাঙালী সন্তানদের হাতে

ভূমিকা

নিজের ডাক্তার নিজেই হওয়া উচিত, পুরোপুরি ভাবে রোগে আক্রান্ত হবার পূর্বে। পুরো রোগে পুরো চিকিৎসা দরকার, তখন চিকিৎসকের সাহায্য নিতেই হবে, কিন্তু তার আগে রোগকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা ও সামান্য অসুস্থতা প্রভৃতি হলে তাকে সারাবার চেষ্টা নিজেদেরই করার কথা। তার জন্য বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের কতক তত্ত্ব সকলেরই জানা চাই। ওর কতকগুলি বিষয়ে ডাক্তার ও জনসাধারণ উভয় পক্ষেরই জানা থাকলে ভালো হয়। আধুনিক শহরের যানবহুল রাস্তায় গাড়ি যাতায়াতের কতকগুলি ট্র্যাফিক বিধি আছে, পুলিশ বিভাগ ছাড়া জনসাধারণকেও তা জানতে হয়, নতুবা তারা রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়িচাপা পড়তে পারে। তেমনি আমাদের আধুনিক জীবনের রোগবহুল রাস্তায় চলা সম্বন্ধেও নানারূপ ট্র্যাফিক বিধি আছে, সেগুলো ডাক্তার ছাড়াও সাধারণের জানা থাকলে তাদের রাস্তার মাঝখানে বারে বারে রোগচাপা পড়তে হয় না। সেই সকল বিষয় নিয়েই আমি পত্রিকাদিতে মাঝে মাঝে সকলের কাজে লাগার মতো প্রবন্ধ লিখতাম। তাতে সাধারণের কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ পেয়েছি। এখন তার থেকে কতকগুলিকে বেছে নিয়ে এই পুস্তকে গ্রথিত করা হলো।

—গ্রন্থকার

নিজের ডাক্তারি

অধিকাংশ রোগই প্রথমটাতে আমাদের নিজেদের হাতের মধ্যে থাকে। কিন্তু তার পরে হাতের বাইরে চলে যায়, তখন ডাক্তারের সাহায্য নিতে হয়। অবশ্য হঠাৎ হুড়মুড় করে আসা বসন্ত হাম প্রভৃতি কতকগুলি সংক্রামক রোগের সম্বন্ধে বাদ দিয়েই এ কথা বলা হচ্ছে। আমরা বলছি অবস্থা অনুযায়ী যে সব অসুস্থতাতে আমরা সচরাচর আক্রান্ত হই সেইগুলির কথা। সেইগুলি যে সংক্রামক নয় এমন কথা নয়, কিন্তু তার বিরুদ্ধে আমাদের এমন কিছু স্বাভাবিক প্রতিরোধ-শক্তি থাকে যা নিয়ে আমরা সময় থাকতে সতর্ক হয়ে লড়তে পারি আর অনেক সময় তাতে জয়ীও হতে পারি, ওষুধের সাহায্য না নিয়ে।

এটা অবশ্য আমরা নিজেরাই জানি নিজের নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা। কার ধাত যে কেমন সে কথা নিজে নিজে প্রত্যেকেই বোঝে। কিসে আমার সর্দি লাগবে, কিসে আমার হজমশক্তি বিগড়ে যাবে, কিসে পেটের অসুখ হয়ে পড়বে, কিসে কাশি বেড়ে যাবে, এগুলো ঠেকে ঠেকে প্রত্যেকেই শিখে নেয়। সেদিক দিয়ে বলতে হয় যে, আমরা নিজেদের সম্বন্ধে নিজেরাই প্রাথমিক ডাক্তার।

কিন্তু এতে অনেক সময় গণ্ডগোলও বেধে যায়। আমাদের নিজের জানাটি অনেক সময় ভুল-জানা হয়ে যায়। এমন প্রায়ই হয় যে নিজে যতটুকু জানি তার ওপর অত্যন্ত বেশী জোর দিই, অন্যে কিছু বললে কিংবা ভুল দেখিয়ে দিলেও সে কথা কানেই তুলি না। নিতান্ত কাবু না হওয়া পর্যন্ত আমরা নিজের বিশ্বাসটিকেই আঁকড়ে থাকি। এইখানেই হয় গণ্ডগোল।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেই এ কথা বুঝতে পারা যাবে। যদুবাবু দেখলেন যে, নিমন্ত্রণ খেলেই তাঁর পেটের অসুখ হয়, তখন আর কিছু না করে কেবল উপোস দিলেই তা সেরে যায়। এর থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, সকল অসুস্থতাতেই আরোগ্যের পক্ষে উপোস দেওয়া একটা অতি উৎকৃষ্ট উপায়। তখন এই দিকেই তাঁর এত বেশি ঝোঁক হলো যে সকলের কাছেই তিনি এটি বলে বেড়াতে থাকলেন। শুধু তাই নয়, সকল ক্ষেত্রেই তিনি এই উপায়টি প্রয়োগ করতে থাকলেন। একটু সর্দি করলেই অমনি তিনি উপোস দেন, একটু গা ম্যাজ্‌ম্যাজ্‌ করলেই উপোস দেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা হলেও তাই, ম্যালেরিয়া হলেও তাই। সামান্য সামান্য ব্যাপারে তাই করতে করতে বৃহৎ ব্যাপারেও তিনি তাই শুরু করলেন। একবার যখন ম্যালেরিয়া ধরল, তখন লঙ্ঘন দিয়েই সে বিপদকে লঙ্ঘন করতে চাইলেন। সবাইকে বললেন, আমি আমার নিজের ধাত বুঝি, ওতেই আমার সেরে যাবে। কিন্তু সেবার ওতে শানালো না, ডাক্তারের কাছে যেতেই হলো, আর উপোস দেওয়ার ফলে যথেষ্ট দুর্বলও হয়ে পড়লেন। আর একবার ধরল প্রবল সর্দি, তাতেও উপোস দিয়ে সারা শহরময় নিজের কাজে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সর্দি বেড়ে গিয়ে সেটা ব্রংকাইটিস দাঁড়িয়ে গেল, হাঁপের কষ্ট হতে লাগল, তখন অগত্যা ডাক্তারের শরণ নিতে হলো। তবু কিন্তু উপোস দেওয়ার উপকারিতা সম্বন্ধে তাঁর ধ্রুব বিশ্বাসটি আজও পর্যন্ত যায়নি। এখানে তাঁর বিচারের বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নেওয়া উচিত যে, সকল রকমের অবস্থাতেই এক রকমের ব্যবস্থা খাটে না। পেটের অসুখ ও হজমের বিকৃতির ব্যাপারে উপোস দেওয়াই সমুচিত ব্যবস্থা বটে, কিন্তু সর্দি জাতীয় অসুখের ব্যাপারে সমুচিত ব্যবস্থা হলো দেহটাকে বিশ্রাম দেওয়া, চুপচাপ ঘরে শুয়ে থাকা। সর্দি-কাশি বা ইনফ্লুয়েঞ্জা জাতীয় রোগ তাতেই সহজে সেরে যায়, বেশি

দূর পর্যন্ত গড়ায় না। অতএব খাদ্যযন্ত্রের বিকারের বেলাতে চাই উপোস, আর শ্বাসযন্ত্রের বিকারের বেলাতে চাই বিশ্রাম। আবার ম্যালেরিয়ার বেলাতে কেবল ঐ সবে চলবে না, কারণ সেখানে ম্যালেরিয়ার জীবাণু শরীরের মধ্যে ক্রিয়া করছে, তাদের মারবার জন্যে চাই কুইনিন বা ঐ ধরনের কোনো জীবাণুনাশী ওষুধের সাহায্য। সেখানে কেবল ধাতের দোহাই খাটবে না।

ছোট ছেলেমেয়েদের পেটের অসুখ প্রায়ই হয়ে থাকে। আর আমাদের দেশের বাপমায়েরা তার নানারকম অর্থ করে থাকেন, ও সেই অনুযায়ী ঘরোয়া ব্যবস্থাও তাঁরা চালিয়ে থাকেন। খুব চড়া গ্রীষ্মের সময় হলে তাকে বলেন পেটে গরম লেগেছে, ঠাণ্ডার সময় হলে বলেন পেটে ঠাণ্ডা লেগেছে, আর অন্য সময় হলে বলেন, লিভারের দোষ হয়েছে। এই লিভারের দোষ কথাটা প্রায়ই যখন তখন শুনতে পাওয়া যায়। তার কারণও তাঁরা দেখিয়ে দেন—গয়লার ভেজাল দুধ, বাজারের ভেজাল তেল ঘি, নতুন ধানের চাল, কৃত্রিম গুঁড়ো দুধ, আরো কত কিছুকেই তাঁরা লিভারের দোষের জন্য দায়ী করেন। আর সেই লিভারের দোষ সারাবার জন্যে ছেলেকে তাঁরা স্রেফ জলবার্লি খাইয়ে রাখতে শুরু করেন। দিনের পর দিন এইভাবেই কেটে যায়, কিন্তু ছেলের লিভার তাতে সারে না। তখন টোট্কা-টুট্কির ব্যবস্থা হয়। তাতেও যখন সারে না তখন ডাক্তারের ওপর চিকিৎসার ভার পড়ে। ডাক্তার দেখেন যে ছেলের কোনো জীবনীশক্তিই নেই। বার্লি ওয়াটার খাইয়ে খাইয়ে তার শরীরের এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, কোন্ দিকটা আগে সামলাবে ঠিক করতে না পেরে ডাক্তারকে হিমসিম খেতে হয়। বলা বাহুল্য, বাপমায়ের এটা ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়, ভুল ধারণা ও ভুল বিশ্বাসের ফলেই এমন শোচনীয় অবস্থা এসে পড়ে। অথচ লিভারের দোষ কথাটাই ভুল, যেমন পেটে গরম লাগা বা ঠাণ্ডা লাগার কথাও

ভুল। ছোট শিশুদের একরকম মারাত্মক ইনফ্যান্টাইল লিভারের রোগ আছে বটে, কিন্তু তার লক্ষণগুলো একেবারে অন্য প্রকৃতির। তা ছাড়া ছেলেমেয়েদের লিভারের দোষ এমনি সাধারণত হতেই পারে না। আসলে যা হয় তা কোনো হজমযন্ত্রের দোষ নয়, তা হলো পেটের মধ্যে অনিষ্টকারী বীজাণুদের সংক্রমণ। মাছিবসা খাদ্যের দ্বারা, ধূলাবালির দ্বারা, ময়লা হাতের দ্বারা, দূষিত পানীয় জলের দ্বারা এবং আরো নানারকম উপায়ে পেটের মধ্যে অনিষ্টকারী বীজাণু ঢুকে পড়ে, আর তাই থেকেই ঐ রকম পেটের অসুখের সৃষ্টি হয়। ডাক্তারি শাস্ত্রে একে বলা হয় ব্যাসিলারি ইনফেকশন। প্রায়ই তা ব্যাসিলারি ডিসেন্টিতে পরিণত হয়। ডিসেন্টি মানে আমাশা, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে যে তার মধ্যে আম ও রক্ত থাকতে দেখা যাবে এমন নাও হতে পারে। সেটা নির্ভর করে বীজাণুদের জাতিচরিত্রের উপর, আর পেটের অন্ত্রাদির মধ্যে কোথায় গিয়ে তারা বাসা বেঁধে ঘায়ের সৃষ্টি করছে তার উপর। হয়তো শুধুই পেটের অসুখের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তাও এই জাতীয় রোগই। ছেলেদের মধ্যে যে নানা ধরনের পেটের পীড়া হতে দেখা যায়, তার অধিকাংশই এই ব্যাসিলারি ডিসেন্টি গোত্রীয়। সেখানে অন্য কোনো চিকিৎসার বা পথ্যাদির ব্যবস্থা না ক'রে আগে বীজাণু-নাশক চিকিৎসাই করা দরকার। তুক্‌তাক্‌ ক'রে সেখানে কোনই ফল নেই।

এইগুলি হলো এক ধরনের ভুল ধারণার দৃষ্টান্ত। আবার এর বিপরীত দৃষ্টান্তও আছে। এমন অনেকে আছেন যাঁদের ধারণা যে আগের থেকে সতর্ক হলে কোনো রোগই হতে পারে না। কথাটার মধ্যে অবশ্য সত্য আছে অনেকখানি, কিন্তু তাঁদের সতর্কতার প্রণালীটাই হয় ভ্রান্ত। তাঁদের ধারণা যে ভিটামিনের অভাবেই আমাদের শরীর দুর্বল হয়ে থাকে, আর তখনই যত কিছু রোগ জন্মাতে পারে।

তাই তাঁরা “এ” থেকে “জেড্” পর্যন্ত সব রকমের ভিটামিনের বড়ি আলমারির তাকে সাজিয়ে রাখেন, আর প্রত্যহই সেগুলির সদ্ব্যবহার করেন। নিজেরাও করেন, ছেলেমেয়েদেরও করান। শুধু তাই নয়, নানারকম ওষুধের শিশিও তাঁদের আলমারিতে সাজানো থাকে, একটু কিছু হলেই অমনি তৎক্ষণাৎ দাওয়াই খেতে ও খাওয়াতে শুরু করেন। কোন্ রোগের পক্ষে কোন্ ওষুধ দিতে হবে সে তাঁদের মুখস্থ। বলা বাহুল্য, তার বেশীর ভাগই পেটেণ্ট ওষুধ, যেমন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট, ব্রংকাইটিস মিকশ্চার, লিভার পিলস্, হার্ট স্টিমুল্যাণ্ট ইত্যাদি। এমন কত নতুন নতুন পেটেণ্ট ওষুধ আজকাল নিত্যই বেরোচ্ছে, কাগজে তার যথেষ্টই বিজ্ঞাপন থাকে, সুতরাং কোন্ রোগের কোন্ ওষুধ জানতে ডাক্তারিশাস্ত্র শেখবার কোনোই দরকার হয় না! কিন্তু রোগের কারণ না জেনে রোগের চিকিৎসা করতে যাওয়া যে কতখানি ভুল সে কথা তাঁদের বোঝাবে কে? তা ছাড়া শরীরের মধ্যে এমনি একটা ঔষধ-নির্ভরতার অভ্যাস এনে ফেলাতে প্রাণপ্রকৃতির স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তি তার কাজ করবার সুযোগ না পেয়ে ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে থাকে। মুড়ি মিছরির মতো ওষুধ খাওয়া ক্রমশই একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। যে সকল ছেলেমেয়েদের এইভাবে নিত্য ওষুধ খাইয়ে খাইয়ে মানুষ করা হয়, তাদের ভাইটালিটি বলে কোনো পদার্থই আর থাকে না।

এমনি আরো কত রকমের ভুল ধারণার ভুল কাজ যে তথাকথিত বুদ্ধিমান মানুষদের করতে দেখা যায়, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। অশিক্ষিত নয়, রীতিমত শিক্ষিত মানুষদের মধ্যেই এই সব বুদ্ধিবিকার দেখতে পাওয়া যায়। স্থির বিবেচনা ও নিরপেক্ষ বিচারের অভাবেই এমন হয়ে থাকে। অথচ আমাদের প্রত্যেকেরই পক্ষে উচিত হলো

নেচারকে বা প্রাণপ্রকৃতিকে সাহায্য করা। এর কোনো বাঁধাধরা নিয়ম থাকতে পারে না। যে ক্ষেত্রে যেমন করা দরকার সেখানে ঠিক তাই করতে হবে, কোনো রকম গোঁড়ামির গোঁ ধরে থাকলে চলবে না। প্রকৃতিকেই আমাদের অনুসরণ করতে হবে, প্রকৃতি আমাদের অনুসরণ করবে না।

শুচিবাই

শুচিবাই নানান রকমের আছে। ওর মূল তাৎপর্যটি এই যে, মনের বিচারে কোনো নোংরা এবং অশুচি জিনিস আমি স্পর্শ করব না। স্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখব, নতুবা আমার অনিষ্ট হবে। যে অনিষ্টকারী তাকে না ছোঁয়াই উচিত, কারণ না ছুঁলে তফাৎ থেকে তার দ্বারা আমার কিছু ক্ষতি হবে না। কিন্তু যদি দৈবাৎ ছুঁয়ে ফেলি? তখন যেখানটা দিয়ে সংস্পর্শ ঘটেছে, সেখানটা বা গোটা দেহটাই শুচি ক'রে নিতে হবে। পৃথিবীতে যত অশুচি বস্তু আছে, তাকে ছোঁয়াতেই যত দোষ ও যত ক্ষতি, এই অন্ধ সংস্কারে।

এর মূল আইডিয়াটি খুব ভালোই, শুচি ও বিশুদ্ধ থাকতে চেষ্টা করা প্রত্যেকের পক্ষেই শ্রেয়। কিন্তু যখন এই ভাবটি অন্ধ ও বদ্ধমূল সংস্কারে গিয়ে দাঁড়ায়, তখন তা অনেক সময় একটা যুক্তিহীন হাসির ব্যাপার হয়ে ওঠে। অর্থাৎ বাস্তবিক কোন্‌টা শুচি আর কোন্‌টা অশুচি তার কোনো যুক্তি নেই, সংস্কারে যা বলবে তাই শিরোধার্য। মল-মূত্র মাত্রই অশুচি, কিন্তু গরুর মল, অর্থাৎ গোবর হলো শুচি, তা হাতে মাখতেও দোষ নেই। গোবরের মধ্যে টিটেনাস রোগের বীজাণু থাকতে পারে। হাতে কোথাও কাটা ঘা থাকলে সেই ক্ষত জায়গাতে বীজাণু প্রবেশ করে টিটেনাস্ রোগ পর্যন্ত জন্মাতে পারে, কিন্তু এ যুক্তি শুচিনিষ্ঠের কাছে অচল। মাটি হলো শুদ্ধ জিনিস, হাতে মলমূত্রাদির সংস্পর্শ লাগলে তারপর একবার খানিকটা মাটি নিয়ে হাতে-মাটি করলেই সব মিটে গেল, অতঃপর সেই হাতে খাওয়াও চলবে এবং অপরকে খাদ্য খেতে দেওয়াও চলবে। কোথাকার মাটি, তাতে কত রকমের বীজাণু থাকতে পারে এবং তা হাতে লেগে থাকায় পেটের

মধ্যে প্রবেশ ক'রে কত কিছুই রোগ জন্মাতে পারে, এ-যুক্তি মাটির শুচিতায় বিশ্বাসীর কাছে অগ্রাহ্য। কলের জলও অপবিত্র হতে পারে, কিন্তু গঙ্গার জল পরম পবিত্র, যেহেতু তাতে দেবতার পূজা হয়। অতএব গঙ্গার জল পান করা না হোক, তাতে আচমন ক'রে দেহ-মন পবিত্র ক'রে নেওয়া যেতে পারে, বাসনাদিও ধুয়ে পবিত্র ক'রে নেওয়া যেতে পারে। তাতে কোনো দোষ নেই। কলেরার প্রাদুর্ভাবের সময় নানা কারণে গঙ্গার জলে অসংখ্য কলেরা বীজাণু ভাসছে, টাইফয়েডের প্রাদুর্ভাবের সময় তারও বীজাণু জলে ভাসছে, সে জল মুখে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে রোগও দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, এ কথা যে বলতে যাবে সে অধর্মী নাস্তিক বলে বিবেচিত হবে। এমনি আরো কত আছে। বস্তুত এখনকার দিনেও আমাদের দেশে ঘরে-ঘরে যে-সকল শুচিবাই-এর নমুনা দেখতে পাই, কেবল মেয়েদের মধ্যেই নয়, কিন্তু পুরুষদের মধ্যেও—তাতে মনে হয় এদের যুক্তি-বুদ্ধি কোথায় গেল! শুচি ভেবে একটা ময়লা গামছা পরে' থাকতে লজ্জাবোধ না করা শিক্ষিত পুরুষদের মধ্যেও দেখা যায়। যেহেতু বংশানুক্রমে তাই চলে আসছে। কিন্তু শুষ্ক বস্ত্রের চেয়ে যে ভিজে এবং ময়লা গামছা কিছুতেই শুচি হতে পারে না, কারণ শুষ্ক বস্ত্রে রোগের বীজাণু লাগলেও তা আলো বাতাস লেগে কিছুক্ষণ পরে মরে যাবে, আর ভিজে ও ময়লা গামছায় তা লাগলে ভালোভাবেই বেঁচে থাকবে, একথা কে তাদের বুঝিয়ে বলবে? বস্তুত অনুসন্ধান নিয়ে দেখলে জানা যেতো, আমাদের দেশে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশা প্রভৃতি সংক্রামক রোগ কিছুতেই যে কমছে না, দেশের লোকের এই সব সংস্কারগত কু-অভ্যাস তার এক অন্যবিধ কারণ।

আমাদের দেশে ভদ্রসমাজে আর এক রকমের শুচিবাই দেখা যায় আজকাল, যাকে বলা যেতে পারে ডাক্তারি শুচিবাই। একটু

আধটু ডাক্তারি জ্ঞান মাথার ভিতর ঢুকলে তার থেকে যে বীজাণু-ভীতি উৎপন্ন হয়, এই শুচিবাই তার থেকেই এসেছে। বীজাণুরাই যে সংক্রামক রোগের মুল কারণ, একথা এখন সকলেই জেনেছে। কথাটা অবশ্য রোগসৃষ্টির দিক দিয়ে নির্ভুল, রোগের বীজাণু শরীরে প্রবেশ না করলে রোগ জন্মাতে পারে না। কিন্তু বীজাণুতত্ত্ব সবটুকু না জেনে আধখানা মাত্র জানার ফলে মনের মধ্যে নানা গণ্ডগোল বেধে যায়। তখন মনে হয় যে, বীজাণুরাই যদি আমাদের মহাশত্রু, তারা শত্রুতা করবার জন্যই সুযোগ খুঁজছে, অতএব হাত দিয়ে কোনো রোগীকে ছুঁয়ে ফেললে আর রক্ষা নেই, তখন সেই রোগের বীজাণু হাত থেকে দেহের মধ্যে ঢুকে যাবে এবং রোগ সৃষ্টি করবেই। বীজাণুরা যেন বুদ্ধিমান প্রাণী, আমাদের চেয়েও অনেক বেশী চতুর। সুতরাং ছোঁয়া-ছুঁয়ি কিছু না করে অতি সতর্কতার সঙ্গে তাদের এড়িয়ে চলা দরকার। এর থেকেই এই রোগঘটিত শুচিবাই!

এ শুচিবাই সবচেয়ে বেশী প্রকট দেখা যায় যক্ষ্মারোগ সম্পর্কে। এমন অনেক লোকই আছে যারা এই রোগের বীজাণু সম্পর্কে দারুণ আতঙ্কগ্রস্ত। তারা নাকে কাপড় চাপা দিয়ে রাস্তায় চলে, পাছে ধুলোর সঙ্গে যক্ষ্মার বীজাণু নাকের মধ্যে ঢুকে যায়। তারা সকল বিষয়ে সন্ত্রস্ত, কোনো বাইরের জিনিস খেতে এবং ছুঁতে ভয় পায়, পাছে তারই ভিতর দিয়ে যক্ষ্মার বীজাণু শরীরে ঢুকে পড়ে। রোগীর ত্রিসীমানায় তারা যায় না। রোগীর ঘরে তো ঢোকেই না, যেহেতু সেই ঘরে যক্ষ্মার বীজাণু সর্বদা উড়ে-উড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তারা একথা জানে না যে যক্ষ্মার বীজাণু সম্পূর্ণ নিরীহ, রাস্তার ধুলোয় পড়ে থেকে রোদ লাগলে তারা অধিকক্ষণ বাঁচতেই পারে না; নিষ্ঠীবনাদি নিক্ষেপের দ্বারা বাতাসে সঞ্চালিত না হলে তারা নিজেরা বাতাসে উড়ে বেড়াতে পারে না কিংবা নাকের মধ্যে আপনা থেকে এসে ঢুকে

পড়তেও পারে না। আর মাঝে মাঝে ঢোকেও যদি নাকের মধ্যে, তাতে বাস্তবিক কোনো ক্ষতি হয় না, কারণ বীজাণু ঢোকা মাত্রই অমনি রোগ জন্মাবে এমন কথা নয়। শহরে যারা বাস করছে এবং সুস্থ আছে, তাদের প্রায় সকলেরই নাকে এই বীজাণু একাধিকবার ঢুকেছে। কারণ শহরে রোগীও যথেষ্ট আর তাদের দ্বারা ছড়ানো বীজাণুও যথেষ্ট। কিন্তু তাতে যে শহরবাসী সকলেরই ক্ষতি হয়নি তার কারণ তাদের স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তি। এই বীজাণুরা অতি মন্থর ক্রিয়াশীল, মানুষের দেহের মধ্যে ঢুকে অন্তত একুশ দিন পর্যন্ত টিঁকে থাকলে তবেই তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও সক্রিয়তা ঘটতে পারে। কিন্তু দেহের ভিতরকার কোষেরা এবং কণিকারা ততদিনে তাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে ও মেরে ফেলে। এবং একবার মেরে ফেলতে পারলে তখন এই প্রতিরোধ ক্রিয়ার জোর আরো বেড়ে যায়, তখন আবার যদি বীজাণু ঢোকে তো আবার তারা মরে। সুতরাং এমন মন্থর চরিত্রের বীজাণুকে অত যমের মতো ভয় করবার কি আছে? এরা রোগ জন্মাতে পারে তখনই, যখন আমার স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে আর প্রতিরোধ শক্তি কমে গেছে। সুতরাং বীজাণুকে ভয় করার চেয়ে নিজেদের স্বাস্থ্যহানিকেই বেশী ভয় করা উচিত। বীজাণু তো নিমিত্ত মাত্র, স্বাস্থ্যহানিই হলো রোগ জন্মাবার আসল কারণ। যক্ষ্মার হাসপাতালে কত ডাক্তাররা রোগীদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে, কত নার্সরা তাদের সর্বক্ষণ সেবা করছে, এরা নাকেও কাপড় দেয় না, ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়েও চলে না; এমনকি রোগীদের সঙ্গে গল্প করতে এবং এক সঙ্গে খেতে বসতেও এদের দ্বিধা হয় না। তবু কিন্তু এদের কারো যক্ষ্মা হচ্ছে না কেন? তার কারণ কেবল শুচিবাই-এর দিকেই এদের নজর নেই, নিজেদের স্বাস্থ্য ভালো রাখার দিকেই এদের নজর আছে। বীজাণুকে অবশ্য এরা সাধ্যমত এড়িয়ে চলে, কিন্তু তা বুদ্ধিপূর্বক, আর নিজেদের

স্বাস্থ্যের দিকেই তাদের বেশী লক্ষ্য। যাদের কোনো নিকট আত্মীয়ের যক্ষ্মা হয়েছে তাদের আমরা এই উপদেশ দেই যে, পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে আর মুক্ত বায়ুতে থেকে নিজেদের স্বাস্থ্যটি ভালো রাখো, রোগীর কাছ থেকে তিন ফুট তফাতে থাকো, রোগী যখন হাঁচবে বা কাশবে তখন যেন সে মুখে রুমাল চাপা দেয় এইটি শিখিয়ে দিও, আর নিজে তখন আরো একটু তফাতে সরে দাঁড়িও—ব্যস্ তাহলে আর কোনোই ভয় নেই। রোগকে অবশ্যই ভয় করতে হবে, রোগের সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে, কিন্তু তা বুঝে-সুঝে। অবুঝের মতো যুক্তিহীনভাবে কেবল অন্ধবৎ শুচিবাইগ্রস্ত হয়ে কোনো লাভ নেই।

টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতি রোগের সম্বন্ধেও এমনি অবুঝের মতো নানা রকম শুচিবাই অনেকের মধ্যে দেখা যায়। রোগীকে তারা সর্বদা এড়িয়ে চলবে, কোনমতে তাকে স্পর্শ করবে না, তার ঘরের দেয়ালে পর্যন্ত হাত ছোঁয়াবে না, যেন ছুঁলেই অমনি রোগটা তাকে ধরে নেবে। সেই ভয়েই রোগীর মলমূত্র কেউ সাফ করতে যাচ্ছে না, সেখানে মাছি বসছে, আবার সেই মাছি উড়ে এসে রান্নাঘরে ঢুকে খাবারে বসছে, সেদিকে কিন্তু কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা ওদিকে খুব সাবধান হচ্ছে, কিন্তু এদিকে মাছির দ্বারা খাবারের মধ্যে বীজাণুর চালান হচ্ছে। এও এক রকমের যুক্তিহীন শুচিবাই। আরো এক রকমের শুচিবাই দেখা যায় বাড়িতে ছেলেপুলেদের মধ্যে কারো হাম, ডিফথিরিয়া বা মাম্পস্ প্রভৃতি রোগ হলে। অন্য ছেলেপুলেদের তখন অনবরত সাবধান করা হয়—ওকে যেন ছুঁসনি। ওর বিছানায় যেন বসিসনি। কিন্তু সুস্থ ছেলেরা সেই রোগীর ঘরে অনবরত ঢুকছে, তার সঙ্গে কথা বলছে, তাতে যেন কোনো দোষ নেই। না ছুঁলেই তো যথেষ্ট সাবধান হওয়া হলো। কিন্তু ঐ সব রোগের বীজ যে ছোঁয়ার দ্বারা সংক্রামিত হয় না, বাতাসে উড়েই নাকের মধ্যে এসে ঢোকে

এবং দূর থেকেও তা ঢুকতে পারে, এ কথা তাদের বোঝানই কঠিন।

এই ডাক্তারি শুচিবাই-এর পরাকাষ্ঠা দেখা যায় চর্মরোগ সম্পর্কে। কারো যদি চর্মরোগ হয়ে থাকে তো এর বিচারে তারা অস্পৃশ্য। যদি কোনো খারাপ জাতের চর্মরোগ বলে মনে সন্দেহ জাগে তো তাকে শত হস্ত তফাতে রাখতে হবে, সামনাসামনি বসতে পর্যন্ত দেওয়া হবে না। তার গায়ে হাত ঠেকে গেলে কিংবা কাপড়ে-কাপড়ে ঠেকে গেলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবিক ছুঁলেই কি দোষ হয়? আমার হাত যদি অক্ষত থাকে আর হাত ধুয়ে ফেলা যদি আমার অভ্যাস থাকে, তা'হলে কোনো রোগই ছুঁতে দোষ নেই। প্রকৃতি আমাদের হাতের চামড়া যথেষ্ট পুরু করে দিয়েছে, তাকে ভেদ করে ভিতরে ঢুকে যাবে এমন কোনো রোগেরই বা কোনো বীজাণুরই সাধ্য নেই। হাতটা পাছে নিজের মুখে দিই কিংবা নাকে দিই, এই জন্যই রোগসংক্রান্ত কোনো কিছু ছোঁবার পরে হাতটা ভালো ক'রে ধুয়ে ফেলা উচিত। কিন্তু ছোঁবো না কিছু, এই ভাবটি থাকা একেবারেই অনুচিত। কোনো জিনিসই ছুঁতে দ্বিধা করব না এবং তারপরে হাত ধুয়ে ফেলব, এই হলো প্রকৃত শুচিতা। সাবান দিয়ে হাত ধোয়া এবং হাতের নখগুলি কেটে ফেলা সর্বোত্তম শুচিতা। ছুঁলেই আমি অশুচি হয়ে গেলাম এ-ধারণাটাই ভুল।

যে খায় চিনি

প্রবচনে এই কথা বলে—"যে খায় চিনি, তার চিনি যোগান চিন্তামণি"। এ প্রবচন কিন্তু নিতান্তই সাম্প্রতিক যুগের। আগেকার যুগে চিনি ছিল না। আমাদের দেশে আখের চাষ বহু পুরাকাল থেকেই হয়ে আসছে, কিন্তু তার রস থেকে তৈরি হতো গুড় আর সেই গুড় থেকে যে শুষ্ক লাল রঙের জিনিস তৈরি করা হতো তার নাম ছিল শর্করা বা শক্কর, বাংলায় দোলো ইত্যাদি। চীন দেশের লোকেরা প্রথমে এ দেশে এসে এই শর্করা প্রস্তুতের বিদ্যা শিখে যায় এবং তারা দেশে গিয়ে এর চেয়ে আরো উন্নততর প্রাণালীতে রিফাইন করা ও দানাবাঁধা ধব্‌ধবে সাদা যে জিনিস প্রস্তুত করতে থাকে তারই নাম হয় চিনি। পরে চীনাদের কাছ থেকে আরো অন্যান্য দেশ চিনি তৈরি করা শেখে। এখন পৃথিবীর সর্বত্রই চিনি তৈরি হয়। কেবল আখ থেকে নয়, জাভা প্রভৃতি দেশে বীট থেকে এবং আরো অন্যান্য দেশে অন্য উপায়ে চিনি তৈরি করা হয়।

এখন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি চিনি খায় ধনবান দেশের লোকেরা, অর্থাৎ আমেরিকানরা। মোটামুটি হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে, আমেরিকা দেশের লোকেরা প্রত্যেকে সব কিছুতে মিলিয়ে দৈনিক গড়ে যতটা চিনি খায় তা এক পোয়ার চেয়েও বেশি বই কম নয়। তারা দুধে, ক্ষীরে, কণ্ডিমেণ্টে, নানারূপ পেসট্রি ও মিষ্টান্নে ও চকোলেট লজেঞ্জে এমন কি চিনি দিয়ে সংরক্ষিত নানাবিধ ফলে এবং আরো কত কিছুতে চিনি ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু ধনী জাতিদের কথা বাদ দিয়ে আমাদের দেশেও যে আজকাল খুব কম চিনি ব্যবহার হচ্ছে তা নয়। বর্তমানে আমাদের দেশে বছরে প্রায়

কুড়ি লক্ষ টন চিনি প্রস্তুত হচ্ছে, কিন্তু তাতেও আমাদের কুলোচ্ছে না। কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগেও আমাদের দেশে চিনির ব্যবহার খুবই পরিমিত ছিল, ক্রমশই এর প্রচলন এখন হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে। আগেকার কালে গুড় খুব সস্তা ছিল বলে অধিকাংশ মিষ্টান্ন গুড় দিয়েই পাক করা হতো, এমন কি যখন চায়ের প্রচলন শুরু হয় তখনও অনেকে গুড় দিয়েই চা খেতো। তারপরে অনেক ক্ষেত্রেই গুড়ের স্থান চিনিতে অধিকার ক'রে নিলে। তার পর থেকে চিনি খাবার মাত্রাও ক্রমশ আমাদের বাড়তে লাগল। চায়েতে প্রথমে এক চামচ চিনি, তার পর দুই চামচ, এখন কারো কারো আবার তিন চামচেও কুলোয় না, আরো আধ চামচ বেশি দিলে ভাল হয়। গরিব লোকেরা অবশ্য এত চিনি খেতে পায় না, কিন্তু যাদের সচ্ছল অবস্থা তারা অনেকে দৈনিক এতে ওতে মিলিয়ে প্রায় আধ পোয়া চিনি তো খায়ই।

চিনি একটা হানিকর খাদ্য বলছি বা চিনি খাওয়া খারাপ বলছি, এ কথা যেন কেউ মনে না করেন। এনার্জি বা শক্তি প্রদায়ক ইন্ধন-খাদ্য হিসাবে চিনি খুবই উৎকৃষ্ট, খাওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ কাজ করে এবং শরীরে শক্তির ইন্ধন সরবরাহ করে। সেই কারণে একে "quick fuel" নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ খড় কিংবা শুকনো পাতা উনুনে দিয়ে দেশলাই লাগানো মাত্রই যেমন তা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, চিনিও দেহের মধ্যে গিয়ে তৎক্ষণাৎ ঠিক তেমনি ভাবেই ইন্ধনের কাজ শুরু করে দেয়। এই কারণেই নানারূপ রোগে দেহের নিতান্ত দুর্বল অবস্থায় গ্লুকোজ ইন্‌জেকশন দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। গ্লুকোজ ইন্‌জেকশন দিলে শরীরে তৎক্ষণাৎ কিছু শক্তিসঞ্চার হবেই। সাধারণ জীবনেও কেউ পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে এলে আমরা তাকে এক গ্লাস মিছরির বা চিনির শরবত খেতে দিয়ে বলি যে, এটুকু খেলেই এখনই ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। সেটা ঠিক কথাই বলি। এক গ্লাস

শরবতের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজকশক্তি আছে। এমন কি তা একটু ব্রাণ্ডি খাওয়ার চেয়ে কম নয়।

কিন্তু কেবল ঐ পর্যন্তই। ঐটুকু ইন্ধনের কাজ ছাড়া চিনির আর অন্য কোনো গুণ নেই (অবশ্য খাদ্যবস্তুকে সুমিষ্ট ও সুস্বাদু ও মুখরোচক করবার গুণটির কথা বাদ দিয়ে ওর আভ্যন্তরীণ গুণের কথাই বলা হচ্ছে)। চিনি ছাড়া অন্যান্য রকমের কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার খাদ্য থেকেও হজমের ক্রিয়াতে ধীরে ধীরে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় এবং ধীরে ধীরেই তা লিভারের দ্বারা গ্লাইকোজেনরূপে সঞ্চিত হয়। কিন্তু চিনির বেলাতে সেই গ্লুকোজ পেটের মধ্যে সরাসরিই তা গ্লাইকোজেন-রূপে সঞ্চিত হচ্ছে। এই গ্লাইকোজেন যদি তৎক্ষণাৎ আমাদের কাজে লেগে যায় তাহলে কোনো কথাই নেই। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় গ্লাইকোজেন মজুত হতে থাকলে এবং তার কোনো সদ্ব্যবহার না হলে শেষ পর্যন্ত তা শরীরের মেদ বাড়াতে থাকে। তা ছাড়া আর কোনো তার কাজ থাকে না। সেই কারণে অতিরিক্ত চিনি যদি প্রত্যহ খাওয়া যায় তাতে লোকে অতিরিক্ত মোটা হয়।

বেশি মাত্রাতে চিনি খাওয়ার এই হলো এক মস্ত দোষ, তাতে শরীরে বেশি চর্বি জমে আর ভুঁড়ি বেড়ে যায়। কঠোর পরিশ্রমী লোকদের পক্ষে সে কথা নয়, তারা যদি বেশি পরিমাণে ভাত খায় বা চিনিও খায়, তাতে তাদের কিছু ক্ষতি হয় না। কারণ যা গিয়ে জমছে তা তখনই সবটা খরচ হয়ে যাচ্ছে, চর্বি তৈরি করবার মতো উদ্বৃত্ত কিছু থাকছে না। কিন্তু পরিশ্রমী গরিব লোকেরা চিনি খাবে কোথা থেকে, তাদের তেমন পয়সা কোথায়? যাদের পয়সা বেশি আছে তারাই বেশি চিনি খায় এবং তারাই বেশি মোটা হয়। মোটা হওয়াও স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর বৈকি। তাতে মানুষকে

পরিশ্রমবিমুখ করে, হার্টকে মেদযুক্ত করে, রক্তের চাপ বাড়িয়ে দেয় এবং আরো নানারকম অসুস্থতা আনে। শরীরকে সুস্থ রাখতে হলে বেশি মোটা হওয়া কখনই উচিত নয়। একথা সকলেই বুঝবে।

আমরা শুনে থাকি যে, বেশি চিনি খেলে ডায়েবিটিস রোগ জন্মায়। কিন্তু সে কথা সকলের পক্ষে নয়। যাদের প্যাংক্রিয়াস যন্ত্র দুর্বল ও তার ক্রিয়াশক্তি বিকৃত তাদের পক্ষেই ওটা হতে পারে। যাদের চিনি খেলেই বহুমূত্র বা ডায়েবিটিসের লক্ষণ দেখা দেয় তাদের ওটা আপনা থেকেই বর্জন করতে বাধ্য হতে হয়। কিন্তু যারা চিনি খেয়ে তা হজম করতে পারে তাদের পক্ষে ওকথা নয়, তা'হলে আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক লোকেরই ডায়েবিটিস হতো।

অপর পক্ষে বেশি চিনি খাওয়ার একটি বিশেষ দোষ এই যে, ওতে ক্ষুধামান্দ্য আনে। বেশি মিষ্টি খেলে অন্য খাদ্য আর কিছুই খাওয়া যায় না। অনেকখানি ইন্ধন যখন চিনি থেকেই মিলে গেল তখন শরীর যন্ত্র আর অন্যান্য খাদ্যের থেকে ইন্ধন নিতে চাইবে কেন? কাজেই বেশি মিষ্টি খেলে তখন আর ভাত বা রুটি বা তরিতরকারি কিছুই খাওয়া যায় না। অথচ আমাদের কেবল ইন্ধন নিয়েই তো কাজ চলবে না। শরীরের জন্য আরো অনেক কিছু উপাদান চাই, সুতরাং মিষ্টির চেয়ে আমাদের ঐ সব জিনিসই বেশি খাওয়ার দরকার। চিনি খাওয়া কমিয়ে দিলেই তা হতে পারবে। পরীক্ষাস্বরূপ যদি তুমি চিনি খাওয়া একদম ছেড়ে দাও, যেমন ডায়েবিটিসের রোগীরা করে থাকে,—অর্থাৎ মিষ্টি কিছুই খেলে না, এমন কি চায়েতে পর্যন্ত চিনির বদলে স্যাকারিন দিয়ে খেতে থাকলে, তাহলে তাতেই দেখবে যে, তোমার খোরাকের মাত্রা দ্বিগুণ বেড়ে যাবে, অন্যান্য সব রকমের খাদ্য অনেক বেশি অনায়াসে খেতে পারবে এবং তা সহজে হজমও হতে থাকবে।

অতিরিক্ত চিনিতে হজমেরও কিছু কিছু বিঘ্ন ঘটায়। সেই চিনি পেটের মধ্যে গিয়ে গেঁজে ওঠে, তার থেকে পেটে বায়ুসঞ্চার হয়। এটা বিশেষ করে রিফাইন করা সাদা চিনিতেই হয়ে থাকে, গুড় বা দোলো বা লাল চিনিতে অতটা হয় না।

কিন্তু এই সাদা ধব্‌ধবে রিফাইন করা চিনিতে আমাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে দাঁত সম্বন্ধে। আমাদের সভ্য মানুষদের মধ্যে প্রায়ই যে দেখা যায় ছেলে-মেয়েদের দাঁতে পোকা হচ্ছে, আমাদেরও অল্প বয়সেই দাঁত ক্ষয়ে যাচ্ছে, দাঁতে পাইওরিয়া হচ্ছে, পঞ্চাশ পেরোতে না পেরোতেই দাঁত নড়ছে, দাঁত পড়ছে, অথচ আমরা দাঁতের যত্ন নিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করছি না, হরদম বুরুশ ঘষছি ও দাঁত সাফ করছি, এই কি মানুষের দাঁতের স্বাভাবিক নিয়তি? তা কখনই নয়। অসভ্য মানুষেরা দাঁতে বুরুষও ঘষে না, কোনো কিছু যত্নও নেয় না, তবু তাদের দাঁত শেষ বয়স পর্যন্ত ঝকঝকে থাকে, তাদের দাঁতে কখনো পোকাও হয় না, সে দাঁত ক্ষয়েও যায় না। শুধু তাই নয়, মহাসাগরের বুকে এমন কতকগুলি দ্বীপপুঞ্জ আছে যেখানে চিনির সরবরাহ নেই, যেখানে লোকে চিনি খেতে আদৌ অভ্যস্ত নয়, সেখানকার মানুষদেরও দাঁত আমাদের মতো এমন খারাপ নয়। যারাই চিনি খেতে অভ্যস্ত তাদেরই দাঁত খারাপ, এটা বিশেষ পরীক্ষা করে দেখা গেছে। মানুষ ছাড়া অন্যান্য জানোয়ারদের দাঁত কখনই খারাপ নয়। কিন্তু আমাদের সঙ্গে থেকে যারা আমাদের খাদ্য খেতে অভ্যস্ত হয়েছে, যেমন গৃহপালিত কুকুর বেড়াল, তাদেরও দাঁত আমাদেরই মতো দুর্বল ও বিকৃত হতে শুরু করেছে আজকাল। তাদেরও দাঁত কন্‌কন্‌ করে, তাদেরও পাইওরিয়া হয়। কারণ তারাও এখন চিনি খাচ্ছে। ঐ সাদা ধব্‌ধবে রিফাইন করা চিনি খেলেই দাঁতের এমনি অবস্থা হবে। তার কারণ স্বাভাবিক আখের রসে ও গুড় প্রভৃতি জিনিসে

কেবল চিনিটুকু ছাড়াও লোহা, ক্যালসিয়ম, ফসফরাস প্রভৃতি আরো অনেক রকম ধাতব উপাদান থাকে, কিন্তু এই সাদা চিনির মধ্যে শুধুই চিনি, আর কিছু না। ছেলেরা যখন লজেঞ্জ চোষে ও নানারূপ মিষ্টি খায়, আর আমরাও যখন দানাদার, রসগোল্লা প্রভৃতি খাই, তখন ওর রস বা চিনি কিছু কিছু গিয়ে জমা হয় দাঁতের চারিপাশের আনাচে-কানাচে ও ফাঁকে-ফোকরে। সেখানে থেকে থেকে তা দাঁতের উপরকার ক্যালসিয়ামকে কিছু পরিমাণে টেনেও নেয় এবং তা ছাড়া সেখানেই জমে থেকে ভিতরে ভিতরে গেঁজে ওঠে। তাতেই সেখানে নানারূপ বীজাণুর আমদানি হতে থাকে, কারণ ঐ গেঁজে ওঠা জিনিসই বীজাণুদের প্রিয় খোরাক। এই কারণে চিনি থেকেই দাঁতগুলি বীজাণু কর্তৃক সংক্রামিত হয়, সে চিনি গেঁজে ওঠা ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত হয় এবং দাঁতের ক্যালসিয়ম কমে গিয়ে দাঁতগুলি ক্রমশ ক্ষয়ে যেতে থাকে। যদি চিনি খাবার পরে প্রত্যেক বারেই আমরা চুনের জল দিয়ে কুলকুচা করে মুখ ধুয়ে ফেলি তাহলে অবশ্য ওটা হতে পারে না, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই চিনি খেয়ে ছেলেবেলা থেকেই আমাদের দাঁতের সর্বনাশ শুরু হয়ে যায়। অথচ চিনি ছাড়া এখন আমাদের গতি নেই। আমাদের দুধে, চায়ে, মিষ্টান্নে, লজেঞ্জে, তরকারিতে পর্যন্ত চিনি চাই।

এর প্রতিকার হতে পারে যদি ছোটো বেলা থেকে ছেলেমেয়েদের এই সাদা ধবধবে রিফাইন চিনি খাওয়া অভ্যাস না করাই। ওর বদলে লাল চিনি খাওয়া যায়, গুড় খাওয়া যায়, মধু খাওয়া যায়। এগুলি হলো অনেকটা স্বাভাবিক খাদ্য, তাই এর থেকে অমন দাঁতের দোষ ঘটতে পারে না। ছেলেবেলায় যদি এরূপ ব্যবস্থা করা যায় তাহলে যৌবন পার হয়ে যাবার পরে সাদা চিনি শুরু করলে ততটা

অনিষ্ট হয় না, কারণ পরিণত বয়সের দাঁত তখন সুদৃঢ়ভাবে তৈরি হয়ে গেছে। তবে বেশি পরিমাণে চিনি খাওয়া কখনই উচিত নয়। আর লজেঞ্জ, চকোলেট প্রভৃতি খাওয়া মোটেই উচিত নয়। আমাদের দেশের লোকেরা যে বলে থাকে বেশি মিষ্টি খেলে পেটে কৃমি হয় সেটা অবশ্য ভুল কথা, কিন্তু ওতে যে দাঁতে পোকা (অর্থাৎ বীজাণু) হয় এটা খুবই ঠিক কথা।

আমিষাশী ও নিরামিষাশী

আহার-বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে পৃথিবীর প্রাণীদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়—আমিষাশী ও নিরামিষাশী। আবার অনেক প্রাণী এমনও আছে যারা দুই-রকমই খায়, বলা যেতে পারে তারা উভয়াশী। আমরা মানুষরা সাধারণত এই উভয়াশীর দলে, দুই রকমের খাদ্যই খেয়ে থাকি, আর আমাদের জটিল জীবনল্যাবরেটারিতে তার প্রয়োজনও আছে, চাহিদাও আছে। তবু কিন্তু ধর্মসংস্কারের কারণে, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কারণে এবং আরো নানা কারণে আমাদের মধ্যেও দুই দলের মানুষ দেখা যায়,—একদল যারা আমিষ না খেয়ে কেবল নিরামিষ খেয়েই থাকে এবং নিজেদের বলে নিরামিষাশী অর্থাৎ ভেজিটেরিয়ান, আর বাকি সবাইকে বলে আমিষাশী অর্থাৎ নন-ভেজিটেরিয়ান।

কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যের নিরামিষাশী ও মানুষের সমাজের নিরামিষাশীর মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। প্রাকৃতিক নিরামিষাশীরা কেবল ঘাস-পাতা ও শস্যাদি ছাড়া আর কিছুই খায় না, তাদের অন্য কিছু খাবার প্রয়োজনই হয় না। আমাদের বেলায় কিন্তু তা নয়। আমাদের নিরামিষাশীরা অন্যান্য প্রাণীদের দেহ থেকে সংগৃহীত দুধ ছানা প্রভৃতি তো খায়ই, কোনো কোনো দেশে ডিমও খায়। আবার আমাদের দেশে অনেকে আমিষ বলে উদ্ভিজ্জ পেঁয়াজ পর্যন্ত ছোঁয় না। সুতরাং হিসাবটা এখানে ঠিক বিচারের নয়, আচারের।

কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি এমন নয়। বিজ্ঞান খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ও ক্রিয়ার দিক থেকে তাকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করে এক জাতীয় উপাদানকে বলেছে প্রোটিন, অন্য জাতীয় উপাদানকে বলেছে

কার্বোহাইড্রেট। প্রোটিন বস্তুর কাজ এই যে, তার থেকে আমাদের দেহের সকল রকম দেহবস্তু নির্মিত হয়, আর কার্বোহাইড্রেটের কাজ এই যে, তার থেকে আমাদের দেহ কর্মশক্তির যোগান পায়। এক কথায় দেহের উপাদান যোগায় প্রোটিন, আর ইন্ধন যোগায় কার্বোহাইড্রেট। বিজ্ঞানের এই খাদ্য বিভক্তির ধুয়া ধরে আমরা আমাদের খাদ্যতালিকার আমিষবর্গকে বলতে আরম্ভ করেছি প্রোটিন খাদ্য, আর নিরামিষবর্গকে বলতে আরম্ভ করেছি কার্বোহাইড্রেট খাদ্য। কিন্তু এ হিসাবটা পুরোপুরিভাবে সত্য নয়, মাত্র আংশিকভাবেই সত্য। কারণ, প্রোটিনবর্গীয় খাদ্য তাকেই বলা উচিত যার মধ্যে প্রোটিনবস্তুটাই মুখ্য, আর সেটি পূর্ণপ্রোটিন হওয়া উচিত, অর্ধপ্রোটিন নয়। অপরপক্ষে কার্বোহাইড্রেট সম্বন্ধেও সেই কথা।

এখানে কোন্ খাদ্যের কোন্ জিনিসটা প্রধানত আমাদের দেহপুষ্টির ও দেহ-কর্মের কাজে লাগছে সেইভাবেই কথাটিকে বিচার করতে হবে। বস্তুত উদ্ভিজ্জ বস্তুর মধ্যেও প্রোটিন আছে আবার জান্তব বস্তুর মধ্যেও কার্বোহাইড্রেট আছে। কিন্তু থাকলেই তো হলো না, কোন্ জিনিসের কোন্‌টা আমাদের বাস্তবিক উপকারে লাগছে তাই নিয়ে কথা। ঘাস-পাতা ও শস্যাদির মধ্যে কি প্রোটিন জাতীয় পদার্থ একেবারেই নেই? আছে নিশ্চয়, যদিও তা অল্পমাত্রায়। কিন্তু হাতি ঘোড়া গোরু প্রভৃতি যে সকল প্রাণী ঐরূপ খাদ্য ছাড়া আর কিছুই খায় না, তারা ওর ভিতর থেকেই সেই প্রোটিনটুকু নিঃশেষে শুষে নেয় এবং তাতেই তাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেহগুলি অটুট থাকে। অবশ্য তাদের প্রচুর পরিমাণেই খেতে হয় এবং প্রায় অনবরতই খেতে হয় নতুবা তাদের চলে না। আবার বাঘ সিংহ প্রভৃতি জন্তুরা মাংস ব্যতীত ঘাস-পাতা প্রভৃতি কিছুই খায় না, কিন্তু তার মধ্যে কি আদৌ কার্বোহাইড্রেট নেই? খানিক পরিমাণে অবশ্যই আছে, তাতেই তাদের কাজ চলে যায়,

নতুবা দেহশক্তি তারা পায় কোথা থেকে? এমন কি প্রত্যহ খোরাক না জুটলেও তাদের তাতে ক্ষতি হয় না। তার কারণ, প্রকৃতি কর্তৃক তাদের দেহপ্রণালী ঐভাবেই গড়া। কিন্তু আমাদের বেলায় তা অন্যপ্রকার। আমরা ঘোড়া গোরুর মতো ঘাস-পাতা থেকেও প্রোটিন সংগ্রহ করতে পারব না, আর জন্তুমাংস থেকেও কার্বোহাইড্রেট সংগ্রহ করতে পারব না। আমাদের পক্ষে নিজেদের পাচ্য ও উপযোগী প্রোটিন-প্রধান খাদ্য থেকেই প্রোটিন নিতে হবে, তদনুরূপ কার্বোহাইড্রেট্-প্রধান খাদ্য থেকেই তা নিতে হবে। আমাদের পক্ষে প্রোটিন সরবরাহের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য হলো মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ। আর কার্বোহাইড্রেট সরবরাহের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য হলো ভাত, রুটি, শর্করা আলু প্রভৃতি মুলজদ্রব্য।

এই দুই জাতের জিনিসই আমাদের বেছে খেতে হবে এবং তার সঙ্গে আরো অনেক কিছু মিশিয়ে, যাতে ভিটামিনের দিকটা বাদ না পড়ে। ঘি, তেল ও লবণাদির দিক এবং স্বাদের দিকটাও বাদ না পড়ে। জীবের ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনের ব্যাপারে যত ক্রমোন্নতি হচ্ছে, খাওয়ার ব্যাপারেও তাই হবে। সব স্তরের জীবের খাওয়া এক রকম হতে পারে না। মনুষ্যেতর প্রাণীদের খাওয়াকে বলব গলাধঃকরণ, আদিম বর্বর মানুষের খাওয়াকে বলব আহার, কিন্তু সভ্য মানুষদের খাওয়াকে বলব ভোজন। আর সেই ভোজনের মধ্যে থাকা চাই পঞ্চোপকরণ। নইলে তা সভ্য মানুষের পক্ষে পুষ্টিদায়ক হবে না। প্রকৃতির এ বিধান মানতেই হবে। ভবিষ্যতে হয়তো এই ভোজন প্রক্রিয়া আরো মার্জিত হতে থাকবে।

সাধারণ বুদ্ধিতে কিন্তু এই কথাটাই বলবে যে, ভাত তরকারি তো আমরা যথেষ্টই খাই, তাতেই আমাদের পুষ্টির কাজ চলে যাওয়া উচিত, ঐসব মাছ মাংস দুধ প্রভৃতি প্রোটিনপ্রধান খাদ্য অত বিশেষ করে নাই

বা খেলাম। আমাদের দেশের গরীবেরা এই ছাড়া আর কিছুই খেতে পায় না, অথচ তারা এতেই বেশ তাগড়া থাকে এবং পরিশ্রমও করতে পারে। ঠিক কথা, কিন্তু তারা ওর থেকেই প্রয়োজনীয় প্রোটিনটুকু সংগ্রহ করে নেয়। যেটুকু প্রোটিন দেহরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য তার মাত্রা খুব কম। ওরা অনেকটা পরিমাণে ভাত, রুটি, মুড়ি, চিঁড়া প্রভৃতি খায়, তার থেকেই কোনগতিকে দেহের অভাবটুকু মিটে যায়। কিন্তু আমরা ওদের মতো অত পরিমাণে খেতেই পারব না, খেলেও হজম হবে না, তার কারণ ওদের মতো পরিশ্রম আমাদের নেই, অতখানি ইন্ধন ওরূপভাবে ব্যয় করবার অভ্যাস নেই। তারা সমস্তটা ইন্ধনই নিত্য ব্যয় করে ফেলে তাদের পরিশ্রমে, কাজেই প্রোটিনটুকুরও পুরোপুরি সদ্ব্যবহার হয়ে যায়। কিন্তু যখন তারা অতটা পরিমাণে খেতে পায় না, তখন তারা প্রোটিনের অভাবে বাঁচে কেমন করে? তার উত্তর এই যে, মস্তিষ্কযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র ও হৃদ্‌যন্ত্র যতক্ষণ পর্যন্ত টিকে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বাঁচবে এবং ঐ তিনটি যন্ত্রের প্রোটিন সরবরাহ সর্বদাই অক্ষুণ্ণ রাখবে—নিজেরই গাত্রমাংস থেকে। যে ব্যক্তি বিনা খাদ্যে কয়েকদিন সম্পূর্ণ উপবাসী আছে, সে খুব তাড়াতাড়ি রোগা হয়ে যায়, তার কারণ, তার নিজেরই মাংসপেশীকে ক্ষয় করে তার থেকে প্রোটিন বেরিয়ে যায় রক্তের মধ্যে, আর সেই প্রোটিন কাজে লাগে ঐ তিনটি যন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে। অতএব বেঁচে থাকার জন্য প্রোটিন আমাদের চাই-ই চাই।

নিরামিষাশী বলবেন যে, তার জন্যে মাছ মাংসই বা খেতে হবে কেন, ডালেও তো যথেষ্ট প্রোটিনবস্তু আছে, তাতেই প্রয়োজন মিটে যাবে। ডালে প্রোটিন আছে বটে, কিন্তু আমাদের পক্ষে তা সর্বোৎকৃষ্ট নয়, তার কারণ আমাদের দেহস্থ জৈবপ্রোটিনের সঙ্গে তা সমগোত্রীয় ও সমগুণযুক্ত নয়। প্রোটিন মাত্রই পেটের মধ্যে ঢুকে

বহুপ্রকার অ্যামিনো অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। তার মধ্যে যেগুলি দেহের পক্ষে গ্রহণযোগ্য সেগুলিকে দেহ নিয়ে নেয়, বাকি সব কোনো কাজে না লাগায় শরীর থেকে এমনিই নির্গত হয়ে যায়। ডালের প্রোটিনের বেলায় তাই হয়, ওর অর্ধেক জিনিসই কাজে না লেগে শরীর থেকে নির্গত হয়ে যায়, অর্ধেক মাত্রই কাজে লাগে, তাই ওকে বলা হয় অর্ধপ্রোটিন। বস্তুত উদ্ভিজ্জ রাজ্যের কোনো প্রোটিনই আমাদের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট পূর্ণপ্রোটিন নয়, কেবল সয়াবিন ছাড়া। তাও খেতে হয় অনেক পরিমাণে। জান্তব প্রোটিনই আমাদের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট, কারণ, আমাদের দেহ তার সবটুকুই কাজে লাগাতে পারে, কিছুমাত্র নষ্ট হয় না। আমাদের দেশের বচনে যে বলে "মাংসে মাংস বৃদ্ধি, ভাতে বৃদ্ধি বল" এ একেবারে খাঁটি কথা। ভাতে পরিশ্রমের বল বাড়ায়, আর পরিশ্রম না করলেই তখন দেহের চর্বি বাড়ায়। কিন্তু মাছ মাংস ডিম দুধ প্রভৃতি খাদ্যের দ্বারাই অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় দেহবস্তুগুলি অতি সহজে রক্ষিত হয়।

এই হলো বিজ্ঞানের কথা। অনেকে মাছ মাংস খাওয়া পছন্দ করেন না অহিংসার অজুহাতে। তাঁরা বলেন, প্রাণীহত্যা করে যে খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে তা না খাওয়াই ভাল। কিন্তু বিজ্ঞান এমন কথা বলছে না যে, প্রাণীহত্যা করেই আমাদের জীবনধারণ করতে হবে। তাতে কেবল বলছে তোমার প্রোটিন খাওয়া চাই, যেমন করে পারো। যাঁদের মাছ মাংস খেতে বাধা নেই, কিংবা ওতে বাধা থাকলেও ডিম খেতে বাধা নেই, তাঁদের সম্বন্ধে কিছুই বলবার নেই। কেবল সেখানে এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, পরিমাণে তা খুবই অধিক খাবার প্রয়োজন নেই, বিশেষ আমাদের দেশে। অমন উৎকৃষ্ট প্রোটিনের অল্পেই আমাদের দেহের প্রয়োজন মিটে যায়,যদি প্রত্যহ খাওয়া হয়। দুই চার টুকরা মাছ কিংবা মাংসে ঠিকই কাজ হবে, বেশিমাত্রায় খেলেও দেহ তার

প্রয়োজনের চেয়ে বেশী একটুও গ্রহণ করবে না, কিন্তু তার থেকে নানা রোগের সৃষ্টি হবে। মাছ মাংস খাও কিন্তু পরিমিতভাবে খাও—এই সারকথা।

যাঁরা নিরামিষাশী তাঁদের পক্ষে দুধই সর্বোৎকৃষ্ট জান্তব প্রোটিন-খাদ্য। তাঁদের পক্ষে দুধ বাদ দেওয়া কখনই উচিত নয়। আমাদের দেশের যে সব প্রদেশের অধিবাসীরা আদৌ মাছ মাংস খান না তাঁরা প্রচুর পরিমাণেই দুধ খেয়ে থাকেন, তার জন্যে প্রত্যেকেই নিজেদের ঘরে গোরু মহিষ পোষেন। সেই কারণে নিরামিষাশী হয়েও তাঁরা বেশ স্বাস্থ্যবান। কেবল বাঙালীরাই গয়লার জোলো দুধ কেনে, আর সেই জলমিশ্রিত বহুমূল্য জিনিস আধ পোয়া খেয়েই মনকে সান্ত্বনা দেয় যে, রোজই দুধ খাচ্ছি। যেখানে ভালো দুধ দুষ্প্রাপ্য, সেখানে ফুলক্রীম গুঁড়া দুধ কিনে অনায়াসে খাওয়া যেতে পারে, তার থেকেও দুধের পুরোপুরি কাজ পাওয়া যায়। দুধের বদলে দই খেলেও প্রোটিনের কাজ পুরোপুরি পাওয়া যায়। দুধ থেকে যে ছানা প্রস্তুত হয় তাতেই দুধের সমস্ত প্রোটিন এসে জমে। দুধ খেতে যাঁরা নারাজ, তাঁরা ওর বদলে ছানা খেতে পারেন, ছানা দিয়ে পাক করা কিছু খেতে পারেন। তার চেয়ে উৎকৃষ্ট রকমের প্রোটিন মিলতে পারে চীজ বা পনিরে (cheese)। এ জিনিস পল্লীগ্রামে মেলে না, কিন্তু শহরে মেলে। অনেকে বলেন, চীজ্-এর যে প্রোটিন তা মাংসের থেকেও উৎকৃষ্ট। দুধের যে প্রোটিন তার নাম কেজীন, এই কেজীন থেকে অতি উৎকৃষ্ট রকমের পেটেণ্ট খাদ্যও আজকাল পাওয়া যায়। দুর্বল রোগী মানুষ তা খেয়ে অতি শীঘ্র সুপুষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

চীন দেশে অনেক স্থানে সয়াবিনের দুধ খাইয়ে ছেলেমেয়েদের মানুষ করা হয়। তাতেও দেহের পুষ্টি হয়, কারণ, ওর মধ্যে উৎকৃষ্ট প্রোটিন

রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে সয়াবিনের তেমন প্রচলন নেই। যে দেশের যেমন রেওয়াজ।

মোট কথা এই যে, কার্বোহাইড্রেট তো আমরা যথেষ্টই খাই। কিন্তু সেই সঙ্গে কিছু প্রোটিন খাওয়া খুবই দরকার। বিশেষ করে ছোটো ছেলেমেয়েদের পক্ষে তা আরো বেশী দরকার, নতুবা ওর অভাবে শরীরের যথেষ্ট বাড় হতে পারে না। সেখানে আমিষ নিরামিষের বিচারটা একটু শিথিল করাই উচিত।

ফলাহার ও ফলার

আমাদের দেশের লোকেরা, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙালী যাদের বলি তারা এখনকার যুগে ফল খাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে— কেবল অবশ্য আমের সময়টি ছাড়া। আম এদেশে প্রচুর জন্মায়, ধনী-দরিদ্র সে সময় সকলেই আম খায়। কিন্তু সে আর কয়টা দিন। বড় জোর একটি মাস আমের বাজার সস্তা থাকে, কারণ তখন যথেষ্ট দেশী আম মেলে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তা ফুরিয়ে যায়। বাইরের থেকে আমদানি আমের দর বেশি, দরিদ্রেরা তা কিনে খেতে পারে না, সুতরাং অল্পকালের মধ্যেই তাদের আমের শখ মিটে যায়। তারপর সাধারণ লোকে আবার যে ফলটি কিছুদিন মাত্র খেতে পায় তা শীতের সময়ের কমলালেবু। তাও কেবল শহরের লোকদের ভাগ্যেই জোটে, যখন লেবু খুব সস্তা হয়। পল্লীগ্রামের লোকেরা এ সুযোগ থেকে প্রায়ই বঞ্চিত। দৈবাৎ তাদের ভাগ্যে জোটে।

কিন্তু বারোমাসই কিছু না কিছু এমন জিনিস আমাদের খাওয়া উচিত যা স্বয়ং প্রকৃতির দ্বারাই আমাদের গ্রহণযোগ্য খাদ্যরূপে প্রস্তুত, যা কৃত্রিমভাবে রেঁধে আমাদের নিজেদের মতলবে প্রস্তুত করা খাদ্য নয়,—অর্থাৎ যার ভিতরকার প্রাকৃতিক উপাদানগুলি সমস্তই অবিকৃত-ভাবে রয়ে গেল, তার কোনো বিকৃতি বা অদলবদল হতে পারল না। প্রকৃতিদত্ত খাদ্যের মধ্যে এমন কতকগুলি সূক্ষ্ম উপাদান থাকে যা আগুনের তাপে নষ্ট হয়ে যায়। জিনিসটি দু-একদিনের বাসি হয়ে শুকোলেও তা নষ্ট হতে পারে, তখন তার সূক্ষ্ম খাদ্যগুণ ও পুষ্টিগুণের তারতম্য হয়ে যেতে পারে। টাটকা ফলে এবং কাঁচা শাকসবজিতেই বিশেষ ক'রে সেই জিনিসগুলি মেলে। আমাদের পাক করা

খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন ও স্নেহপদার্থ প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও ঠিক ঐ বিশেষ জিনিসগুলি তার মধ্যে থাকতে পারে না। যেমন ভিটামিন সি। কাঁচা শাকসব্‌জি ও তরিতরকারীর মধ্যে এ জিনিস যথোচিত ভাবেই আছে, কিন্তু উনুনে চড়িয়ে আচ্ছা করে ভেজে সাঁতলে সিদ্ধ করে চচ্চড়ি বা ঘণ্ট বানালেই সে সূক্ষ্ম বস্তু একেবারে লোপ পেয়ে যাবে। তার অন্যান্য সবরকম খাদ্যগুণ বজায় থাকলেও ঐ জিনিসটি তার থেকে আমরা পাবো না। অথচ ভাত, তরকারী ও ডাল রুটি প্রভৃতি পেট ভরে খেলেও স্বাস্থ্যকে পুরোপুরি বজায় রাখতে ঐ জিনিসটি আমাদের চাই। আগেকার কালে ঐ জিনিসের গুণও আমরা জানতাম না, ওর অভাবও বোধ করতাম না। তার কারণ আগেকার কালে লোকে অসভ্য ছিল বলেই হোক আর প্রায় বিনামূল্যে মিলত বলেই হোক, নানারকম ফলপাকড় আর কাঁচা শাক কাঁচা মুলো প্রভৃতি এমনিতেই খেতে অভ্যস্ত ছিল। পাড়া-গাঁয়ের ছেলেরা গাছ থেকে পেয়ারা পেড়ে খেতো, কাঁচা আম, আমড়া, কাঁচা তেঁতুল, জাম, জামরুল, লিচু, ফল্‌সা, বৈঁচি, কুল, টেঁপারি প্রভৃতি নিত্যই খেতো। আর বেশি বয়সের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরাও কাঁচা শসা, কাঁচা ছোলা, শাঁকালু, বাতাবি প্রভৃতি খেতে ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য বোধ করত না। কাজেই না জেনেও তারা ভিটামিন জাতীয় জিনিসটি থেকে কেউই বঞ্চিত হতো না। কিন্তু এখনকার কালে নানা কারণে আমাদের খাদ্যে ঐ জিনিসের অভাব হচ্ছে; আর ওর অভাবে কি অনিষ্ট হয় সে কথাও বিশেষ করে জানা যাচ্ছে। এখন জানা যাচ্ছে যে, ঐ সব খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন অতি প্রয়োজনীয়।

চিকিৎসাশাস্ত্রে জানা গেছে যে, ভিটামিন সি-র অভাবে স্কার্ভি হয়। এ একরকমের রক্তদোষের ব্যাধি। দাঁতের গোড়া হঠাৎ আল্‌গা হয়ে যাওয়া, সেখান থেকে রক্তপাত হতে থাকা এবং রক্ততারল্যহেতু

দেহের যে কোনো স্থান থেকে অকস্মাৎ রক্তপাত হতে থাকা, রক্তশূন্যতায় শরীর দুর্বল ও অশক্ত হয়ে পড়া প্রভৃতি এ রোগের লক্ষণ। এই মারাত্মক স্কার্ভি রোগটিকে পুরোপুরিভাবে আজকাল আর কোথাও দেখি না বটে, কারণ সকলেই সাবধান হয়েছে আর এই ভিটামিনসংযুক্ত কিছু-না-কিছু পরিমাণে সকলেই আবার খেতে শুরু করেছে। কিন্তু খেলেও প্রায়ই তা যথেষ্ট নয়, সুতরাং স্কার্ভি না হলেও তার কাছাকাছি রকমের নানা লক্ষণযুক্ত অসুস্থতা প্রায়ই দেখা যায়। যেমন, ছেলেদের দাঁতওঠার পক্ষে এই ভিটামিনটি খুবই দরকার। তারা যতদিন মায়ের দুধ খায় ততদিন এই ভিটামিন ঠিক পরিমাণে পেতে থাকে। কিন্তু যখন মায়ের দুধ ছাড়িয়ে অগ্নিপক্ক গোদুধ খাওয়ান হয়, আর দাঁত ওঠবার সময় আসে, তখন ক্যালসিয়াম ফস্‌ফরাস, ভিটামিন এ এবং ডি প্রভৃতি দাঁতের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় জিনিস পেতে থাকলেও এটির অভাবে দাঁতের নানারকম দোষ হতে দেখা যায়। আর প্রথম বয়সে একবার দাঁতের দোষ জন্মালে তা আর জীবনে ঘুচতে চায় না। বিশেষজ্ঞরা তাই বলেন যে, ঐ সময়ে শিশুদের পক্ষে দ্বিগুণ পরিমাণ ভিটামিন-সি দরকার। নতুবা দাঁত ও দাঁতের মাড়ি দুর্বল হবে, দেহের বড় বড় হাড়ের প্রান্তগুলিও ভালোরকম গজাবে না, হাড়গুলি পল্‌কা হয়ে যাবে। কৈশোর ও যৌবনকালেও এই ভিটামিনের খুব দরকার। এর অভাবে স্ত্রী-পুরুষোচিত যৌবনলক্ষণগুলি সুপরিস্ফুট হতে পারে না। তা ছাড়া এই বয়সে মানুষকে যে সব সংক্রামক রোগ প্রায়ই আক্রমণ করে, এর অভাবে তার বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার শক্তিও জন্মায় না। যারা ভিটামিন সি-যুক্ত খাদ্য প্রচুর পরিমাণে খেতে অভ্যস্ত তাদের স্বভাবতঃই সেই শক্তি থাকে, রোগে তাদের সহজে কাবু করে না।

পরিণত বয়সে ও বৃদ্ধ বয়সেও এই ভিটামিনের বিশেষ প্রয়োজন

আছে। এর আংশিক অভাবে স্কার্ভি বা তদনুরূপ রোগ না জন্মালেও দেহ প্রায়ই অল্পবিস্তর অসুস্থ হয়, আর কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দেখা দিতে থাকে, যেমন গাত্রবর্ণ ও চুলের জ্যোতি ম্লান হয়ে যাওয়া, দেহে স্ফূর্তির অভাব, হাতে পায়ে ও গাঁটে-গাঁটে ব্যথা বোধ হতে থাকা ইত্যাদি। বিশেষতঃ পায়ের নানা স্থানে এমন ব্যথা হয় যে, মনে হয় বুঝি বাতে ধরল। কিন্তু তা মোটেই নয়। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি খেতে শুরু করলেই সে ব্যথা আপনি সেরে যায়। সময়ে সময়ে গায়ে অত্যন্ত চুলকানি হয়, তাও এই ভিটামিন সি খেলে তৎক্ষণাৎ সেরে যায়।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পক্ষেও এই ভিটামিন খাওয়া খুবই দরকার। এর অভাবে তাদের রক্তের তেজ কমে যায়, সন্তানের ভালো বাড় হয় না। ক্ষুধা কমে যায়, অরুচি এসে পড়ে ও নানারকম রোগ আক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে। সেইজন্য গর্ভকালে এমন সব খাদ্য খেতে বলা হয় যাতে ভিটামিন সি গ্রহণের মাত্রা দ্বিগুণ বেড়ে যাবে।

কোন্ কোন্ জিনিসে এই ভিটামিনের মাত্রা সব চেয়ে বেশি আছে? কিন্তু কিসে কিসে আছে তাই জানাই যথেষ্ট নয়, তার মধ্যে কোন্‌টি আমাদের পক্ষে উপযোগী তাও সেই সঙ্গে ভেবে দেখতে হবে। বিজ্ঞানে বলছে যে, কাঁচা শালগমের শাকে ও বাঁধাকপিতে এই ভিটামিন সব চেয়ে বেশি। সেই কারণে আমেরিকা প্রভৃতি দেশের আধুনিকেরা এই শাক ও বাঁধাকপি স্যালাডরূপে কাঁচাই খাচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে এমনি কাঁচা খাওয়ার কথা বলতে গেলে বাড়ির গৃহিণীরা হাসবেন মাত্র, কাজে কিছুই হবে না। বিজ্ঞানে আরো বলছে যে, আমলকীর মধ্যে এই ভিটামিন সবচেয়ে বেশি আর তা এতই স্থায়ী যে, আমলকী শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে রাখলেও তাতে এই ভিটামিন বহুকাল বজায় থাকে। কিন্তু যে ভাবেই হোক আমলকী হয়তো শখ করে দু'একদিন

মাত্রই খাওয়া চলে। আমাদের পক্ষে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে খাবার মতো খাদ্য এ নয়।

সব রকমের লেবু জাতীয় ফলই এই ভিটামিন সরবরাহের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, অন্তত আমাদের দেশে। কমলালেবু তো বটেই। খেতেও সুস্বাদু, ছেলে বুড়ো কারোই আপত্তি হবে না। কমলালেবু যতদিন পর্যন্ত পাওয়া যায় ততদিনই তা কতক পরিমাণে প্রত্যহ খাওয়া চলবে। যখন এ লেবু না মিলবে তখন শরবতি লেবু রয়েছে, বাতাবির সময় বাতাবি রয়েছে, আরো অনেক কিছু আছে। আম, লিচু ও আনারস প্রভৃতি তো আছেই আমাদের দেশে। সবাই তা খেতে পারে, আর আশ্চর্য এই যে, এই তিনটি ফল ঠিক পরে পরেই আবির্ভূত হয়। আম ফুরোলেই লিচু, লিচু ফুরোলেই আনারস, আর আনারস ফুরোলেই বাতাবিলেবু। এর সবগুলিকেই অম্লগুণী সাইট্রাস-বর্গীয় ফল বলে ধরে নেওয়া চলে, সবগুলিতেই সাইট্রিক অ্যাসিড আছে।

তারপরে আরো বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো টোম্যাটো বা বুটবেগুন। একে আমরা তরকারির মধ্যে স্থান দিই, কিন্তু বস্তুত একে ফল বলাই উচিত। টোমাটো কাঁচাও খাওয়া যায়, চাটনী করেও খাওয়া যায় ও রস নিংড়ে শরবত করেও খাওয়া যায়। অবশ্য রেঁধেও খাওয়া যায়, কিন্তু তাতে আর ভিটামিন তখন থাকে না। টোমাটো কাঁচাই খাওয়া দরকার। এ ছাড়া আমরা কাগজি, পাতি, গোঁড়া প্রভৃতি নানা রকমের লেবু খেতে পারি, তাও এই হিসাবে খুব উপকারী। টক ফল খেলে অনিষ্ট হবে এ ধারণাটাই আমাদের ভুল। লেবুর টকে সাধারণত অম্বল হয় না, কারণ ওর অ্যাসিড পেটে গিয়ে সাইট্রেটে পরিণত হয়। তবে বাতিকগ্রস্ত ডিসপেপসিয়া রোগীদের পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। তাদের তো কিছুই হজম হয় না, সব জিনিসেই 'অম্বল' দেখা দেয়। কিন্তু এমনিতে লেবু অম্লকারক নয়।

এ ছাড়া আমাদের দেশে আরো নানারকমের ফল মেলে এবং সস্তাতেও মেলে। তার থেকে পছন্দ ও রুচি অনুযায়ী অনেক ফলই বেছে নেওয়া যায়। আমরা অনেকে ফল খাওয়ার কথা শুনলেই ভাবি যে ওটা বড়লোকের বিলাসের খাদ্য। অনেকে মনে করে যে, খুব দাম দিয়ে আঙুর, বেদানা, আপেল, ন্যাসপাতি নানারূপ মেওয়া ফল কিনে খেতে পারলে তবেই হলো ফল খাওয়া। কিন্তু বাস্তবিক এ ধারণাও ভুল। বেশি দামী ফল হলেই যে তাতে বেশী দামী ভিটামিন থাকবে এমন কথাই নয়। বরং দূর থেকে আমদানি ঐ সব বাসি ফলের চেয়ে স্থানীয় সদ্য গাছপাড়া টাটকা ফলে তা অনেক বেশি থাকে, ফল ও শাকসব্জি যতই বাসি হয় ততই তার ভিটামিনগুণ কমে যায়। আরো একটা ভুল আমরা প্রায়ই করে থাকি ডাব খাওয়া সম্বন্ধে। ডাবের জল ও শাঁস কিছু উপকারী বটে, মুখরোচক বটে, স্নিগ্ধগুণীও বটে, কিন্তু চার-পাঁচ আনা পয়সা খরচ করে একটি ডাব কিনে খেয়ে যদি মনে করি যে, এতে শরীরে পুষ্টি হবে তাহলে তা ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। তার বদলে ঐ পয়সাতেই অনেক টাটকা ফল কিনে খাওয়া যেতে পারে এবং তাতে অনেক বেশি উপকার হয়। অন্তুতপক্ষে তাতে খানিকটা অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি পেটে যায়। প্রত্যহ নিয়মিত ডাব খাওয়া কেউ কেউ অভ্যাস করে থাকেন, তাতে মনের একটা তৃপ্তি ছাড়া বিশেষ কোনো উপকার নেই।

কিন্তু অনেকে প্রশ্ন করবেন, ফল কেমন ভাবেই বা খাওয়া যায়? তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে কাজে বেরোতে হয়, সেখানে বসে বসে ফল খাবার বা ফুরসত কোথায়? সে কথা যদিও অনেকের পক্ষেই সত্য বটে, তবে এর এক ভালো উপায় আছে। সাহেবদের মতো দৈনিক চার পাঁচ দফা খাওয়া না হলেও অন্তত তিনবার করে

সকলকেই এই দেশে খেতে হয়। যারা দশটায় খেয়ে অফিস আদালতে যায় তারা বিকেলে ফিরে কিছু জলযোগ করে, আবার রাত্রে ভাত কিংবা রুটি খায়। ব্যবসা প্রভৃতির কাজে অনেকে আবার সকালে কিছু জলযোগ করে বেরোয়, অনেক বেলায় ফিরে ভাত খায়, আবার রাত্রে ভাত কিংবা রুটি খায়। সুতরাং সকলের পক্ষেই দুটো হয় প্রধান খাদ্য, আর একটা হয় জলযোগ। এই জলযোগের সময়টিতেই যাহোক কিছু দোকানের খাবার বা নানারকম জিনিস না খেয়ে তখন ফলাহারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমাদের দেশে আগেকার দিনে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে ফলার দেবার পদ্ধতি ছিল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা ফলার খেতে খুব ভালবাসতেন। শোনা গেছে শ্রীচৈতন্যদেবও এমনি ফলার খাওয়া পছন্দ করতেন, তাকে বলা হতো মালসাভোগ। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, চিঁড়া, দই, দুধ, ছানা, মুড়কি, মিষ্টান্ন প্রভৃতি একত্রে মেখে তার মধ্যে যখনকার যা ফল মেলে সমস্তই টুকরো টুকরো করে কেটে মিশিয়ে দেওয়া হতো। এ অতি উপাদেয় খাদ্য, খেতেও সুস্বাদু এবং খাদ্যগুণের তরফ থেকে সব দিক দিয়েই উপকারী। আমরাও প্রত্যেকে নিজেদের ঘরে ঘরে সেই প্রাচীন ফলার খাবার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারি। তার মধ্যে কবে কোন্‌টা মিশ্রিত করা হবে তার কোনো বাঁধা নিয়ম থাকবে না, যেদিন যে সময়ে যেমন ফল জোটে তাই চিঁড়ে, দই বা দুধ ও গুড় বা চিনির সঙ্গে একত্রে মিশিয়ে প্রত্যহ ফলারের জলযোগ হতে পারে। তা কখনো একঘেয়ে হবে না, কারণ ঋতুতে ঋতুতে ফলের বদল হতে থাকবে। অবশ্য ফল না খেয়ে প্রত্যহ ভিটামিন সি-র বড়ি খেলেও কাজ হয়। কিন্তু বিশেষ কোন রোগ থাকলে ওষুধ হিসাবে তা খাওয়া যেতে পারে, যখন শরীর সুস্থ থাকে তখন ভিটামিন খাচ্ছি ভেবে কতকগুলো বড়ি খেয়ে চিরকাল কাটানো যায় না।

ব্যারামের বাতিক

পরশুরামের "চিকিৎসা সংকট" নামক হাসির গল্পটি যারা পড়েছে তারা সকলেই জানে যে, নন্দবাবুর শরীরে বাস্তবিক কোনো ব্যারাম ছিল না, ট্রাম থেকে নামতে একটু আঘাত লাগবার পর থেকেই পাঁচ-জনের কথায় ও নানা কারণে তাঁর ধারণা জন্মাল যে, তিনি অসুস্থ। তাই অনেক রকম পদ্ধতিতে তিনি নিজের চিকিৎসা করালেন, কিন্তু কোনো চিকিসাতেই আরোগ্য হলেন না। শেষকালে যে ব্যবস্থায় আরোগ্য হলেন তা সম্পূর্ণ মানসিক। এটি কেবলই হাসির গল্প নয়, চিকিৎসক এবং জনসাধারণ উভয়েই আমরা এই থেকে বিশেষ একটা শিক্ষা পেতে পারি।

রোগের বাতিক অর্থাৎ 'আমি অসুস্থ' এই বিশ্বাস হওয়া সংসারে নিতান্ত বিরল নয়। এর কোনো আদমসুমারি ক'রে দেখা হয়নি, কিন্তু এখনকার সভ্য ও শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে যদি অনুসন্ধান নিয়ে দেখা যায় তো জানা যাবে যে, এর সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশ ভাগের কম নয়। অর্থাৎ শতকরা অর্ধেক যদি হয় সত্যিকার রোগ, তো অর্ধেক ভাগ অন্তত রোগের বাতিক।

অথচ কোন্‌টা রোগ আর কোন্‌টা রোগের বাতিক তা চেনা অনেক সময় খুবই কঠিন। কারণ জ্বর কিংবা জ্বর-নয় তা মেপে দেখবার যেমন থার্মোমিটার আছে, মানুষটা সুস্থ কিংবা অসুস্থ তা মেপে দেখবার তেমন কোনো থার্মোমিটার নেই। যে সকল রোগ শারীরিক যন্ত্রাদির বাস্তব বিকৃতি বা বীজাণু সংক্রমণ বা প্রদাহঘটিত, সেগুলিকে অনায়াসেই ধরা যায় আজকালকার নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা, সে পরীক্ষা কখনো ভুল কথা বলে না। কিন্তু তা ছাড়াও মানুষের

এমন অনেক অসুস্থতা আছে যা ঐরূপ কোনো যান্ত্রিক পরীক্ষায় ধরা যায় না বা ধরবার প্রশ্নই সেখানে আসে না। অসুস্থ ব্যক্তির মুখের কথাকেই সেখানে সত্য বলে মেনে নিতে হয়। কবিরাজেরা নাড়ি টিপে বায়ুরোগ ধরতে পারেন, পিত্তের প্রকোপ প্রভৃতি ধরতে পারেন, কিন্তু সে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা। শুধু কবিরাজীতেই বা কেন, সকল পদ্ধতিতেই এ ব্যাপারে চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়। কবিরাজেরা অনেক সময় যাকে বায়ুরোগের পর্যায়ের মধ্যে ধরেন তা এই বাতিক ছাড়া কিছু নয়। ডাক্তারেরাও যখন নানারূপ পরীক্ষাদির দ্বারা কোনো বাস্তব রোগের হদিশ না পান তখন তার নাম দেন নিউর্যাস্থিনিয়া, নিউরোসিস, মানসিক দৌর্বল্য ইত্যাদি। অবশ্য এগুলিও রোগ বৈকি, তবে তা 'মানসিক' দৌর্বল্যজনিত।

কিন্তু মানসিক দৌর্বল্য বললেই তো ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মনের থেকেই হোক বা যার থেকেই হোক, লোকটি বাস্তবিক কোনো অস্বস্তি ও অসুবিধা বোধ করছে বলেই ডাক্তারের সাহায্য নিতে এসেছে। সুতরাং তার প্রতিবিধান অবশ্যই একটা কিছু করা দরকার। ডাক্তার তখন তার চিকিৎসাবিদ্যার শরণাপন্ন হয়। রোগের লক্ষণ অনুযায়ী স্নায়ুর উত্তেজনা কমিয়ে দেবার কিংবা স্নায়ুর স্ফূর্তি বাড়িয়ে দেবার, স্নায়ুগুলি আরো বেশি খাদ্য দিয়ে চাঙ্গা করে তোলবার, যথাযথ ওষুধ দিয়ে সমগ্র দেহযন্ত্রটাকেই আগাগোড়া সংস্কার ক'রে দেবার প্রয়াস ক'রে থাকে। অনেক সময় এতে যে বেশ কাজ হয় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক সময় আবার তেমন কিছু কাজ হয় না, অর্থাৎ রোগীর বাতিক ছাড়ে না। তখন ডাক্তার মহা বিব্রত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তার রোগীকে বলতে বাধ্য হতে হয় যে, ওটা তোমার মনের বাতিক। বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তিটি নিজের বাতিকের কথা

শুনে খাপ্পা হয়ে ওঠে, রোগ তখন রাগে পরিণত হয়। এই ডাক্তারকে ছেড়ে সে যায় দ্বিতীয় কারো কাছে। তিনিও আবার একটু বিজ্ঞের মতো হেসে ঐ ধরনেরই প্রক্রিয়া গোড়া থেকে শুরু করেন। এমনি ব্যাপারই পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে। কিন্তু বাতিক ছাড়ে না।

রোগের বাতিক এমনি কত রকমেরই আছে। সবচেয়ে সাধারণত যা দেখা যায় তা হলো কোষ্ঠবদ্ধতার বাতিক। কোনো দিনই তাদের পেট পরিষ্কার হয় না, অর্থাৎ দেহের মল পরিত্যাগ ক'রে তাদের মন খুশি হয় না, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের কাছে প্রত্যহই তারা এই নালিশটি জানাতে থাকে। বেল, ইশপ্‌গুল প্রভৃতি থেকে শুরু ক'রে ডাক্তারি, কবিরাজী ও হেকিমি যত রকমের দাওয়াই আছে সবই তারা একে একে পার ক'রে দিয়েছে, প্রত্যেকটিতেই মাত্র দুই একদিনের জন্য ফল পেয়েছে, তার পরে যে-কে সেই। যেদিন যতটুকু নির্গত হবার মতো মল থাকবে সেদিন ততটুকুই তো নির্গত হবে। বর্জনোচিত পদার্থ জীবন্ত দেহের মধ্যে চিরদিন আটকে থাকতে পারে না, কিন্তু এই সহজ যুক্তির কথা তাদের বোঝানোই দায়। অথচ তৎসত্ত্বেও দিনের পর দিন এবং বছরের পর বছর তারা দিব্য সুস্থ শরীরেই জীবনযাপন করছে, কিন্তু মনের ঐ খুঁতখুতুনি নিয়ে, কোষ্ঠ তাদের বড়ই বিকল।

তার পরে হজমের দোষ, ডিস্‌পেপসিয়া। এ রোগ বাঙালীদের মধ্যে অনেকেরই, এবং অনেক ক্ষেত্রে তার বাস্তব কিছু কারণও থাকে। ভালোভাবে চেষ্টা করলে সে কারণ খুঁজেও বের করা যায়, এবং তার যথোচিত চিকিৎসাও করা যায়। সেই সব কারণের মধ্যে রয়েছে হয়তো কোনো বীজাণুর সংক্রমণ, কিংবা খাদ্যের দোষ, কিংবা খাওয়ার দোষ, কিংবা কোনো যন্ত্রের দোষ ইত্যাদি। কিন্তু যাদের সে সব কিছু নয়, কেবলই বাতিক, তাদের নালিশ এই যে, কোনো খাদ্যই

মনোমতভাবে হজম হচ্ছে না। সর্বদাই তারা পেটে হাত বুলোচ্ছে, ঢেকুর তুলছে, পেট দম্‌সম্‌, মেজাজ তিক্ত ও তিরিক্ষি। বাইরে দিনকতক চেঞ্জে গেলে তারা কতকটা ভালো থাকে, আবার ফিরে এলেই পূর্ববৎ। হজমের ওষুধ সবগুলিরই নাম তারা জানে, ওষুধ খেয়েই তো কোনো রকমে বেঁচে আছে! আজকাল তাদের জন্য নানারকম নতুন ধরনের পেটেণ্ট ওষুধের বহু আবিষ্কারও হচ্ছে। তার মধ্যে নেই কোন্‌ বস্তু? আইডোকুইনোলিন ও টাকা-পেপ্‌সিন থেকে শুরু ক'রে ঈস্ট, লিভার একস্ট্রাক্ট, কেজীন, যাবতীয় প্রাচীন ও নবাবিষ্কৃত ভিটামিন, যাবতীয় গ্লাইসিরোফসফেট বর্গ, মেথিওনিন, কোলিন, স্ট্রীক্‌নিন প্রভৃতি সবকিছু ভেষজ ও জান্তব ও রাসায়নিক দ্রব্য মিলিয়ে একটা সুদর্শন চক্রের ব্যাপার, সকল দোষকেই সবদিক থেকে কেটে নির্মূল ক'রে দেবে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এ সকল ওষুধেও তাদের কিছু উপকার হয় না। তাদের রোগও থাকে, আর তারা ওষুধও খেতে থাকে। এটাই তাদের বিশেষ রকমের বাতিক।

আরো এক রকমের বাতিক আছে যুবক ও যৌবনপারের পুরুষদের মধ্যে। তার নাম দেওয়া যেতে পারে যৌনদুর্বলতা। অর্থাৎ যতটা যৌনবল থাকা বাঞ্ছনীয় ততটা যেন তাদের নেই। এর কারণও তারা নিজেরাই আবিষ্কার করে—অপরিণত বয়সে তাদের যৌনযন্ত্রাদির অযথা ব্যবহার। আর তথাকথিত ধাতুদৌর্বল্য বা যন্ত্রদৌর্বল্য জিনিসটাও অধিকাংশই মনগড়া, মনই সেই কথাটা আগের থেকে আঁচ ক'রে রাখে, তাই কার্যগতিকেও তাই হতে দেখা যায়। মনে এ বিষয়ে চিন্তা না থাকলে এমন অবস্থা আসতেই পারে না। যৌনসংক্রান্ত সঠিক ও সময়োচিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাবেই যুবকদের মধ্যে এমন ভ্রান্তির বাতিক জন্মায়। তখন চলে চিকিৎসার পালা। সকল রকমের চিকিৎসাই একে একে করা হয়। প্রত্যেক চিকিৎসকই ভাবেন একটা

কিছু করা দরকার, প্রত্যেকে তাঁর বিদ্যা অনুযায়ী যথাসাধ্য করেন। কেউ দেন হর্মোন, কেউ দেন যৌনগ্ল্যাণ্ডের এক্স্ট্রাক্ট, কেউ বা উত্তেজক ভেষজ, কেউ বা স্নায়ুস্নিগ্ধকারক, কেউ তেজস্ক্রিয় ভিটামিন, কেউ মাথায় মাখবার তেল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। কিন্তু তার পরে যখন বিবাহাদি হয়, তখন এ রোগ আপনিই সেরে যায়, অর্থাৎ তখন দেখা যায় যে, আগেকার সেই অপব্যবহার সত্ত্বেও স্বাভাবিক যন্ত্র স্বাভাবিকই আছে। প্রত্যক্ষ ফল দেখে তখন সেই বাতিক ঘোচে।

আর এক হলো থাইসিস রোগের বাতিক। সত্যিকার থাইসিস অবশ্য আমাদের দেশে কম নয়, কিন্তু মিথ্যা বাতিকের থাইসিস তার চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি। এটা আসে প্রাণের ভয় থেকে। এ রোগের বিভীষিকার কথা লোকের মুখে শুনে, গল্পে উপন্যাসে পড়ে এবং হয়তো চোখেও কিছু কিছু দেখে এই ভয়টি জন্মায়। তার পর সদাই আশংকা। একটু শরীর খারাপ, একটু সর্দিকাসি, একটু জ্বরজারি হলেই অমনি মনে হতে থাকে, এইরে, এবার ঐ রোগই ধরল বুঝি। তখন ডাক্তার দেখানো হয়, এক্স্‌রে পরীক্ষা করানো হয়, আরো অনেক কিছুই করা হয়। কিছু হয়নি শুনেও মনের খুঁতখুঁতনি কাটতে চায় না। যেন ফাঁসির হুকুম জারি হয়ে গেছে, এখন আর তাকে চাপা দিয়ে কি লাভ আছে!

আরো একরকম দেখা যাচ্ছে আজকাল, হার্টের রোগের বাতিক। আগে এতটা ছিল না, যা কিছু ছিল তা মেয়েদের মধ্যে, যেমন বুক ধড়ফড় করা, বুক চেপে ধরা, দম আটকে আসা ইত্যাদি। এগুলোকে বায়ুরোগ বা হিস্টিরিয়া বলেই ধরা হতো। কিন্তু আজকাল করোনারি থ্‌রম্‌বোসিস্‌ প্রভৃতিতে হঠাৎ মৃত্যুর কথা শুনে এবং খবরের কাগজে পড়ে পুরুষদের মধ্যেও হার্টের সম্বন্ধে একটা অতি-সচেতনতা এসে পড়েছে। একটু কিছু বুক ধড়ফড় বা হাঁফ লাগার মতো হলেই মনে

হয় এই বুঝি হার্টফেল হবার পূর্বলক্ষণ। আর ভয় থেকেই ভয়ের লক্ষণেরও সৃষ্টি হয়। মনের সঙ্গে হার্টের খুবই ঘনিষ্ঠ সংযোগ, মনে একটু উদ্বেগ উঠলেই অমনি হার্টটিও দ্রুত চলতে শুরু করে। হার্ট খুব ধক্ ধক্ করছে, এটা নিজের কানেও শুনতে পাওয়া যায়। তখন ব্যস্ত হয়ে ছুটতে হয় ডাক্তারের কাছে—একবার আমার হার্টটা দেখুন তো কেন এমন করছে। এমন একবার দু'বার নয়, বহুবারই ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করানো শুরু হয়। বলা বাহুল্য, নানারকম ওষুধপত্র খাওয়াও হতে থাকে। অতিশয় সাবধানে তারা জীবনযাপন করে।

কিন্তু এই সব রোগের বাতিক আমাদের জীবনে আসে কোথা থেকে, আর এর প্রতিকারই বা কি? মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বলেন, এসব অবচেতন মনের ক্রিয়া। ছেলেবেলাকার কোনো দুষ্কৃতি, কোনো দুর্বলতা, কোনো ভয়, কুটিল আকার নিয়ে অচেতন মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। সহজে তা প্রকাশ পায় না, কিন্তু পরবর্তী জীবনে কোনো একটা ছুতা পেলেই সেই গোপন জিনিস তখন এই বিকারের মূর্তি ধরে বেরিয়ে পড়ে। সে তখন এমন ছদ্মবেশ নেয় যে, তাকে নিজেরই মনের দুর্বলতার জিনিস বলে আর চেনাই যায় না। মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা তাই বলেন যে, আগেকার জীবনের সকল গোপন ইতিহাসকে আলোড়ন ক'রে অর্থাৎ পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে এর আসল মূর্তিটাকে ধরিয়ে দিতে পারলেই বাতিকটা তখন আপনিই সেরে যাবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাই হয়ও বটে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নয়। বাতিক যখন একবার ভালোরকম ধরে গেছে তখন তাকে হাতেনাতে ধরিয়ে দিলেও সে কিছুতেই দমতে চায় না। মনের মধ্যে সে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব চালিয়ে যায়। মনকে দিয়ে সে বলাতে থাকে যে, সকল কথাই মানলাম, কিন্তু আমি যে বাস্তবিক এত কষ্ট পাচ্ছি তার তো কিছু কিনারা করা দরকার।

এর একমাত্র উপায় নিজের মনের জোরে রোগের ধারণাটিকে সর্বক্ষণ প্রত্যাখ্যান করতে থাকা। যা হচ্ছে তা তো হচ্ছেই, কিন্তু যখন জানছি যে, এটা আসল রোগ কিছুই নয়, তখন একে রোগ বলে মানব না, এর দ্বারা নিজেকে উতলা হতে দেব না। একে আমি গ্রাহ্য করব না, এই নিয়েই আমার নিজের সব কাজগুলি ক'রে যাবো, আর নিজের মনকে খুশি রাখবো। এ-প্রচেষ্টা অবশ্য প্রথম প্রথম ব্যর্থ হতে থাকবে। কিন্তু তবু অনেককাল পর্যন্ত ধৈর্য ধরে লেগে থাকতে হবে। তা যদি পারা যায় তাহ'লে ক্রমে ক্রমে বাতিকের প্রকোপ আপনিই কমে আসবে। মনের জোরে অনেক কিছুই সম্ভব হয়, এমন কি অনেক সত্যিকার রোগও সারানো যায়। বাতিক রোগের এমন মানসিক চিকিৎসা সকলের পক্ষেই সম্ভব। তবে এর জন্য ধৈর্য চাই। ব্যস্ত হলে চলবে না, একটুও নিরাশ হলে চলবে না।

রোগ বাঁচিয়ে চলা

মানুষের জীবনে এত রোগ বাঁচিয়ে চলতে হয় যে, একে আমরা এক দারুণ বিড়ম্বনা বলেই মনে করি। এমনিতেই বেশ সুস্থ থাকবো, যা খুশি খেয়ে নেবো, যেমন খুশি ঘুরে বেড়াবো, কোনো সাবধানতার পরোয়া রাখব না, অবহেলা অত্যাচারের ভিতর দিয়ে নিশ্চিন্তে দিন কেটে যাবে, এমনটি হলেই যেন আমরা খুব খুশি হতে পারি। জন্তু-জানোয়ারেরা তো বেশ নিশ্চিন্তেই তাদের জীবন কাটায়, আমাদের মতো তারা এত সাবধান হয়ে থাকেও না আর সাবধান হতে জানেও না, কিন্তু তাদের সেজন্য কিছু ভুগতে হয় না, তবে আমাদের বেলাতেই বা এমন কেন ?

এ প্রশ্নের জবাব প্রকৃতির কাছেই মিলবে। প্রকৃতি জন্তুদের মধ্যে দিয়েছে এত বেশি সহজাত প্রতিরোশক্তি যা আমাদের মধ্যে নেই। তারা অনায়াসে নর্দমার জল খায়, ধুলোকাদা মাখা কত নোংরা জিনিস খায়, তবুও তাদের কলেরা হয় না। ঠাণ্ডায় তাদের নিউমোনিয়া নেই, গরমে সর্দিগর্মী নেই। আমরা আশ্চর্য হয়ে ভাবি ওদের অমন কেন, আর আমাদের বেলা এমন কেন ? দুই জাতের জীবের মধ্যে প্রতিরোধশক্তির এমন তারতম্য কেন ? কিন্তু একটু খবর নিলেই জানা যাবে যে, আদিম যুগে এ-তারতম্য ছিল না, প্রস্তরযুগের মানুষদের প্রতিরোধশক্তি ছিল অনেকটা জন্তুদেরই মতো, তাদের মধ্যেও সাবধানতার মাত্রা ও রোগের মাত্রা খুব কম ছিল। এখনকার কালেও তাই দেখি যে, অসভ্য বর্বর জাতিদের মধ্যে আমাদের মতো এত রোগ হয় না। খাদ্যপানীয় সম্বন্ধে তাদের বাচ-বিচার খুবই কম, কুখাদ্য ও কুপানীয় খেয়েও তারা সুস্থ থাকে। কেবল সভ্য মানুষদেরই খুব

হুঁশিয়ার থাকতে হয়, একটু অসাবধান হলেই অমনি হাতে হাতে তার শাস্তি ভোগ করতে হয়। অর্থাৎ যাদের বুদ্ধিবৃত্তি নেই, কিংবা থাকলেও তেমন বিকাশ পায়নি, প্রকৃতি যেন নিজেরই শক্তি দিয়ে তাদের রোগ বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখছে, আর বুদ্ধিবৃত্তি যাদের যত বেশি বিকাশ পাচ্ছে তাদের পক্ষে প্রকৃতি সেই সাহায্য ক্রমশই কমিয়ে নিয়ে বলছে যে, তোমাদের তো বুদ্ধি গজিয়েছে, এইবার তোমরা সেই বুদ্ধিকে পুরোপুরি কাজে লাগাও, নিজের সম্বন্ধে নিজেরাই সাবধান হতে শেখো,—প্রকৃতি যেন ইঙ্গিত করছে যে, আমি আর তোমাদের সামলে রাখব না, এবার তোমরা ঠেকে শিখে নিজেদেরকে সামলাও। ব্যাপারটা বাস্তবিকই অনেকটা সেই রকম। তাই দেখা যায় যে, মানুষের বুদ্ধি যত প্রখর হচ্ছে, চিকিৎসা বুদ্ধি ও স্বাস্থ্য বুদ্ধি যতই তাদের বেড়ে যাচ্ছে, রোগের সংখ্যা এবং জটিলতাও সঙ্গে সঙ্গে ততই বেড়ে যাচ্ছে। আগে যে সব কঠিন রোগের নামই শোনা যায়নি, এখন সেই সব রোগের ছড়াছড়ি, বিশেষত সভ্যসমাজে। রোগ যেন আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। এই রোগে-মানুষে যুদ্ধে আমরাও যত নতুন নতুন অস্ত্র বের করছি রোগও তার তরফ থেকে তত নতুন নতুন অস্ত্র বের করছে। এতে আর কিছু না হোক একটা লাভ এই হচ্ছে যে, প্রতিটি যুদ্ধে জিতে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি উত্তরোত্তর প্রখর ও পরাক্রমী হয়ে উঠেছে। আর এতে বোঝা যাচ্ছে যে, নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা কেবল জানোয়ারের থাকা, বুদ্ধিমান মানুষের থাকা তেমন হবার কথা নয়।

অতএব আপাতত এইভাবে আমাদের লড়ে যেতে হবে। রোগের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিয়ে যেতে হবে। যতকাল বাঁচব ততকাল রোগের কাছে নিত্য মার খেতে খেতে না বেঁচে সুস্থ অবস্থাতেই বাঁচা আমাদের বুদ্ধির কাছে কাম্য। চিরকাল যদি রোগে ভুগেই জীবন

কাটালাম তাহলে জীবনের কাজগুলো করব কখন ? অতএব আমাদের সাবধান হওয়াই চাই। তার জন্য আগে যে সব উপায় অবলম্বন করতে হতো না, এখন দরকার হলে তাও করা চাই। একেই বলছি রোগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা।

চিকিৎসার কথা আলাদা। এখানে আমরা বলছি রোগকে প্রতিরোধ করারই কথা। রোগ যেখানে আমাদের আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে, আমরা তার আগে থেকেই তা বুঝে নিয়ে তাকে প্রতিরোধ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকব। সুযোগ পেয়ে আক্রমণ করতে এলেই সে যেন তৎক্ষণাৎ বাধা পায়, আমরা তার আক্রমণের আগে থেকেই পরিখা প্রাচীর গড়ে তুলেছি দেখে সে যেন বিফল হয়ে ফিরে চলে যায়। প্রকৃতিদত্ত স্বাভাবিক প্রতিরোধশক্তি আমাদের দেহে খানিকটা পর্যন্ত আছেই, কিন্তু তাতে আজকাল প্রায়ই কুলায় না, কাজেই নানা উপায়ে আমাদের সেই শক্তিকে বাড়িয়ে নিতে হবে।

রোগ মোটামুটি দুই রকমের আছে। একরকম হলো আগন্তুজ, অর্থাৎ যা বাইরের থেকে বা অন্যের শরীর থেকে এসে আমাদের আক্রমণ করে, যেগুলোকে আমরা সংক্রামক রোগ বলি। আর একরকম হলো স্বভাবজ, অর্থাৎ যা আমাদের অযত্ন, অপব্যবহার ও অত্যাচার দোষে নিজেদেরই ভিতর থেকে জন্মায়,—সেখানে রোগ হয় নিজেদেরই গৃহশত্রু, বাইরের শত্রু নয়। এদের প্রতিরোধ দুই দিক থেকে দুইরকম ভাবে করা দরকার।

প্রথমে বলা যাক আগন্তুজ বা সংক্রামক জাতীয় রোগগুলির কথা। কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ যে দারুণ সংক্রামক অর্থাৎ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ থেকেই জন্মায়, এই কথা মানুষের মগজে প্রবেশ করার পর থেকে সাধারণ লোকের মনে একটা সংস্পর্শ-

বিভীষিকা অন্ধ সংস্কারের মতো বদ্ধমূল হয়ে গেছে। তাদের ধারণা যে, রোগীকে ছুঁলেই ঐসব রোগ যেন লাফিয়ে এসে তাদের তৎক্ষণাৎ ধরে নেবে, কিন্তু তফাতে তফাতে থাকলে আর তা কোনোগতিকে ধরবার কোনো ভয় নেই। অতএব ঐসব রোগ থেকে বাঁচতে হলে ছোঁয়া-ছুঁয়ির দিকেই সব চেয়ে বেশি লক্ষ্য রাখা দরকার। রোগ পরিহার করতে রোগীকে পরিহার করাই উচিত। এই ধারণা থেকে সাধারণের মনে রোগ সম্বন্ধে একটা শুচিবাই এসে গেছে, ছোঁয়াকেই সব চেয়ে বেশি ভয়। কিন্তু এর মতো ভ্রান্তি আর কিছু নেই। একথা সহজেই বোঝা যেতে পারে যে, তা যদি হতো তাহলে ডাক্তার ও নার্স, যারা অনবরতই নানা রোগীদের ঘাঁটছে, তারাই সবচেয়ে বেশি রোগে আক্রান্ত হতো। কিন্তু বাস্তবিক তা হয় না, কারণ কোনো রোগই একজনের দেহ থেকে আর একজনের দেহে অমন করে লাফিয়ে যায় না। প্রত্যেক রোগকেই একটা কিছু মাধ্যম কিংবা বাহনের ভিতর দিয়ে সংক্রামিত হতে হয়। রোগের সংক্রমণ মানেই রোগের নির্দিষ্ট বীজাণুর সংক্রমণ। সেটা কোথাও বা আসে বাতাসের ভিতর দিয়ে, কোথাও বা খাদ্য পানীয়ের ভিতর দিয়ে, কোথাও বা মশা-মাছির দ্বারা। প্রতিরোধ করতে হলে সেই বুঝেই তাদের প্রতিরোধ করতে হয়। কিন্তু সব জায়গায় তা সম্ভব নয়। কলেরার বেলাতে সমস্ত খাদ্য পানীয় আগুনে সদ্য ফুটিয়ে খেলে আর ও রোগ সম্বন্ধে ভয় নেই। কিন্তু বসন্ত প্রভৃতি রোগের বীজ অনেক দূর থেকেও বাতাসে ভেসে এসে নাকের মধ্যে ঢুকে রোগ জন্মাতে পারে। সেখানে কেমন ক'রে তা আটক করা যাবে? কাজেই সেখানে ওভাবে নয়, প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে অন্যভাবে। আমাদের স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তিকেই প্রত্যেকটি রোগের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কৃত্রিম উপায়ে বাড়িয়ে নিতে হবে, কারণ দেখা গেছে যে এই শক্তির প্রকৃতি এবং ক্রিয়া প্রত্যেক রোগ সম্বন্ধেই স্বতন্ত্র।

কেমন উপায়ে আমাদের দেহের সীমাবদ্ধ প্রতিরোধশক্তিকে অনেকখানি পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে? সেই গূঢ়তত্ত্বের প্রথম আবিষ্কার করেন জেনার। বসন্ত রোগের মৃদু গোবীজ নিয়ে মানুষের গায়ে ঢুকিয়ে দিলে তাতে সামান্যই বসন্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু ঐ টুকুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে শিখে এবং ওকে অনায়াসে জয় ক'রে তখন প্রতিরোধশক্তি এতটাই বেড়ে যায় যে, তার পর আসল মারাত্মক বসন্তরোগের বীজ বাতাসের ভিতর দিয়ে শরীরে এসে পড়লেও সেখানে আর দন্তস্ফুট করতে পারে না। একে বলে ভ্যাক্সিন দেওয়া, বাংলায় টীকা দেওয়া। এইভাবে তিন চার বছর অন্তর একবার করে টীকা দিলে বসন্ত রোগ জীবনে আর হতেই পারবে না।

যক্ষ্মা রোগের প্রতিষেধক যে বি. সি. জি. ভ্যাক্সিনের আজকাল উদ্ভাবনা হয়েছে তাও কতকটা এই ধরনের ব্যাপার। এই ভ্যাক্সিনের মধ্যে আছে অতি-মৃদু বিষের যক্ষ্মাবীজ। এর ব্যবহারে প্রকৃত যক্ষ্মার আক্রমণ সম্পর্কে পাঁচ ছয় বছর পর্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকা যায়। সুতরাং যেখানে যক্ষ্মা রোগের সংক্রমণ আসবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা আছে, বিশেষত অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের পক্ষে এই ভ্যাক্সিনটি নিয়ে নিরাপদ হওয়াই উচিত। কেউ কেউ এই বি. সি. জি. ভ্যাক্সিনের নিন্দা করছেন, এর দ্বারা সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত ক'রে অনিষ্ট ডেকে আনার আশঙ্কা করছেন। কিন্তু সে আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। যক্ষ্মারোগের সংক্রমণ বায়ুবাহী, তাকে প্রতিরোধ করবার অন্য কোনো উপায় নেই। যাঁরা এই ভ্যাক্সিন প্রস্তুত করছেন তাঁরা এমন দায়িত্বজ্ঞানশূন্য নন যে ভালো করতে গিয়ে মানুষের অনিষ্ট করবেন। বিভিন্ন দেশে বহু লোকের মধ্যে প্রয়োগ করে যথেষ্ট পরীক্ষার পর নিরাপদ জেনেই তবে তাঁরা সকলকে এটা নিতে বলছেন।

বসন্তের জন্য টীকা এবং যক্ষ্মার জন্য বি. সি. জি. ছাড়া আরো

নানারূপ রোগের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নানারূপ ভ্যাক্সিন আছে। সেগুলি সেই সেই রোগের মৃত বীজাণু থেকে প্রস্তুত করা হয়। মৃত বীজাণু শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে শরীরকে জীবন্ত বীজাণুসৃষ্ট রোগের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করে তোলবার ব্যাপারটা প্রায় বন্দুকে শিকার করতে শেখার মতো। আনাড়ী শিকারীকে যেমন গোড়াতেই জ্যান্ত শিকার করতে দেওয়া হয় না, আগে মৃতবস্তুতে চাঁদমারি শিক্ষা করিয়ে নিয়ে তার পরে আসল শিকার করতে দেওয়া হয়, এর বেলাতেও তেমনি আমাদের দেহরসকে আগে মৃতবীজাণু বিষকে জয় করতে শেখানো হয়। তারপরে সে তখন অনায়াসে জ্যান্ত বীজাণুর বিষকে জয় করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এ-শক্তি চিরস্থায়ী হয় না। তাই ভ্যাক্সিন বিশেষে তা এক দুই বা তিন চার বছর অন্তর প্রয়োগ করতে হয়।

যে দেশে যে সময়ে যেমন রোগের প্রাদুর্ভাব হবার সম্ভাবনা, সেই বুঝে আগে থেকে সেই রোগের বিরুদ্ধে ঐরূপ প্রতিষেধক নিয়ে নিলে তোমার শরীরে সেই রোগটি আর হতেই পারবে না। আমাদের দেশে কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, এই তিনটি রোগের প্রাদুর্ভাব প্রতি বছরেই প্রায় হয়ে থাকে। সুতরাং এই তিনটি রোগের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিষেধ নেবার ব্যবস্থা প্রতি বছরেই করতে হয়, বিশেষত শহর অঞ্চলে; নিরাপদ ব্যবস্থা হলেও এতে অবশ্য দেহে ইনজেকশনের খোঁচা সইতে হয়, তার পরে শরীরও তাতে কিছু অসুস্থ বোধ করে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার কি করা যাবে। সভ্য হয়ে আমরা শহর অঞ্চলে বাস করছি, কলকারখানার বস্তির ভিড়ের মধ্যে বহু লোকের সংস্রবে নিত্য আসতে হচ্ছে, অথচ সম্পূর্ণ সভ্য এখন আমরা হইনি। ঐ সকল সংক্রামক রোগকে দেশ থেকে এখনও তাড়াতে পারি নি। রাশিয়া জার্মানি প্রভৃতি যে সব দেশ থেকে এ রোগগুলি নির্মূল হয়ে গেছে তাদের এই সব প্রতিষেধক নেবার দরকারই হয় না। আমাদের

দেশে যখন তেমন অবস্থা হবে তখন আমরাও এই কৃত্রিম ব্যবস্থা থেকে রেহাই পাবো। কিন্তু আপাতত বাঁচবার জন্য ওর সাহায্য নিতেই হবে।

আরো কতকগুলি রোগের জন্য নিয়মিত না হলেও সময় বিশেষে প্রতিষেধের ব্যবস্থা করতে হয়। যেমন দেশে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হলে তখন প্লেগের ভ্যাক্সিন নেওয়া দরকার; কারো বাড়িতে ডিফথিরিয়া হলে তখন তার বিরুদ্ধে বাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়েদের ওর প্রতিষেধক দিয়ে দেওয়ার দরকার। বাড়িতে বা পাড়ায় কারো হুপিং কাসি হলে তার বিরুদ্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা দরকার। পোলিও রোগের বিরুদ্ধেও তেমন ব্যবস্থা হয়েছে। দুঃখের বিষয় আর কোনো রোগের বিরুদ্ধে করা যায় না। ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে ভ্যাক্সিন থাকলে আমাদের পক্ষে খুব ভালই হতো, কিন্তু ওর বীজের ভ্যাক্সিন হতে পারে না।

আরো একটি প্রতিষেধের ব্যবস্থা আমাদের জীবনরক্ষার জন্য নিশ্চয়ই করতে হয়, তা টিটেনাস্ বা ধনুষ্টংকার রোগের বিরুদ্ধে। দেহের চামড়া কোথাও কেটে ছিঁড়ে গেলে বা ক্ষত হলে এবং তাতে ধুলা ময়লা লাগলে তার থেকে ঐ রোগ জন্মাবার খুবই সম্ভাবনা। কোথাও এমনভাবে কেটে গেলে যদি তৎক্ষণাৎ টিটেনাস্ বিরোধী সিরাম ইন্‌জেকশন নিয়ে নেওয়া হয়, তবে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ, ঐ রোগ হতে পারবে না। এ-ব্যবস্থা প্রত্যেকের পক্ষেই করা উচিত, কারণ ও রোগ অতি দুরারোগ্য, ধরলে আর নিস্তার নেই। পাগলা কুকুরে কামড়ালেও এই কারণে তার প্রতিষেধক ইনজেক্‌সন যথানিয়মে নেওয়া অবশ্যই কর্তব্য। তাতে জলাতঙ্ক রোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

দেহে কোথাও কেটে ছিঁড়ে গেলে আমরা প্রায়ই একটু টিঞ্চার আইওডিন ঘষে দিয়ে একটু টিঞ্চার বেঞ্জিন কম্পাউণ্ড লাগিয়ে নিশ্চিন্ত

হয়ে মনে করি যথেষ্টই করলাম। কিন্তু ওতে অধিকাংশস্থলে যথেষ্ট করা হয় না। আইওডিন যে খুব জোরালো প্রতিষেধক তা নয়। আইওডিন লাগানো সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে ঘা-বিষিয়ে যায়, অর্থাৎ বীজাণু সংক্রমিত হয়। আজকাল ওর চেয়ে আরো অনেক ভালো ভালো বীজাণুনাশক প্রতিষেধক ওষুধ বেরিয়েছে। তারই মধ্যে কোনো একটা সংগ্রহ ক'রে রাখা উচিত এবং যথা সময়ে তাই প্রয়োগ করা উচিত।

আদিমকালে মনুষ্যদেহের বাহন ছিল গরুর গাড়ি আর পাল্কি, তখন তাকে চালু রাখতে বিশেষ কিছুই হাঙ্গামা করতে হতো না, খুব বেশী যত্নেরও দরকার হতো না। কিন্তু এখন সেই বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে মোটর গাড়ি প্রভৃতি। তার দ্বারা যদিও আগের চেয়ে অনেক ভালো রকমের কাজ পাওয়া যায়, কিন্তু তেমনি তার যত্নও নিতে হয় আগের চেয়ে খুব সূক্ষ্মভাবে। পরিমাণ বুঝে এতে নিত্য তেল জল যোগাতে হবে, ইন্ধন যোগাতে হবে, বেশী খাটালেও বিগড়ে যাবে, এমনি আরো অনেক ব্যাপার আছে। এ নিতান্ত ব্যর্থ উপমার কথা বলা হচ্ছে না। শরীরকে সুস্থ ও কার্যক্ষম রাখতে হলে বর্তমানে আমাদের অমনি সূক্ষ্ম-বিচারী ব্যবস্থাই করা দরকার। নতুবা নিজেদের দোষেই নিজেদের ভিতরের কলগুলি বিগড়ে যাবে। তার জন্য আমাদের নিজেদেরই দায়ী হতে হয়, বাইরের থেকে আসা কোনো দুর্ভাগ্যকে দায়ী করা যায় না।

এ তো গেল এক কথা। দ্বিতীয় কথা হলো, বর্তমানে আমাদের কৃত্রিমভাবে জীবন যাপনের অভ্যাস। এ জিনিস আগেকার কালে খুবই কম ছিল, বর্তমানেই এসে পড়েছে আর ক্রমশই তা বেড়ে যাচ্ছে। তার ফলে এমন সব ব্যাধিপীড়ার আমদানি হয়েছে যা আগেকার কালে ছিল না, অথবা খুবই কম ছিল। সেই অভ্যাসগুলিকে এখন আর

বর্জন করা সম্ভব নয়, কিন্তু অবশ্যই তাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে, যাতে ওরই কারণে আমাদের সুস্থ শরীর অযথা অসুস্থ হয়ে না পড়ে।

শরীর রক্ষার ব্যাপারে নিয়মিত পানাহার, মলমূত্র ত্যাগ, পরিশ্রমের কাজ ও নিদ্রার বিশ্রাম আমাদের দৈনিক কর্তব্য। এরই ইতরবিশেষে কতকগুলি দৈহিক অসুস্থতার সৃষ্টি হয়, যাকে বলি স্বভাবজ ব্যাধি। আমাদের যত অনিয়ম, অত্যাচার ও অবিবেচনাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেগুলির জন্য দায়ী। বিশদভাবে সেগুলির কথা বলা এখানে সম্ভব নয়, তবে মোটামুটিভাবে খানিকটা বলা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আগেই বলতে হয় ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার কথা। এ রোগের নানা লক্ষণ, নানা বৈচিত্র্য আছে এবং তার কারণও নানা প্রকারের। পৃথিবীর সকল দেশেই এ রোগটি মানুষকে ধরে, কিন্তু আমাদের দেশেই সব চেয়ে বেশী। তার কারণ আহারাদি সম্বন্ধে আমরা যত অন্যায় অত্যাচার করি এমন আর কোনো দেশেই নয়। তার কারণ খাওয়া সম্বন্ধে আমরা কোনো নিয়মের ধারই ধারি না। হজমের যন্ত্রগুলির কাজ যে রীতিমত ধারাবাহিকভাবে চলে, এবং এক দফা কাজ তার ঘাড়ে চাপিয়ে সেটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত যে আবার এক দফা কাজ তার ঘাড়ে চাপানো উচিত নয়, তাতে যন্ত্র বিগড়ে যায়, এই সহজ বোধটি আমাদের খুবই কম। অনেক জানোয়ারদের মধ্যেও এই সহজ বোধটি আছে, তারা যখন তখন খায় না, একবার খেয়ে তা হজম করতে না করতে তখনই আবার খায় না। কিন্তু আমাদের দেশে এমন ব্যবস্থা যে, কারো ঘরে বন্ধু-বান্ধব বা অতিথিসজ্জন যখনই আসুক, তখনই তাকে মিষ্টিমুখ করাতে হবে, যেহেতু এই সামাজিক নিয়ম। অন্তত-পক্ষে চা তৈরি ক'রে তো খাওয়াতেই হবে। বাড়ির ছেলেমেয়েদেরও যখন তখন যা খুশি খেতে উৎসাহ দেওয়া হয়, সর্বক্ষণ খাওয়ানোটাই যেন

বিশেষ আদর। তার কোনো নিয়ম থাকার দরকার নেই। অনেকের তাই বড়ো হয়েও সেই অভ্যাস থেকে যায়, তারা পথ চলতে চলতেও চানাচুর চিবোয় এবং আরো কত কি। কিন্তু নিয়মে খাওয়া এবং সময়ে খাওয়া যে কত ভালো এবং তাতে শরীর ও পেট যে কত সুস্থ থাকে, তা যারা এ বিষয়ে অভ্যাস করেছে তারাই জানে।

আমাদের মধ্যে আর এক দোষ যত্রতত্র খাওয়া, নিমন্ত্রণ খাওয়া এবং হোটেলে খাওয়া। অবশ্য এটা শহরের লোকদের মধ্যেই, পল্লীগ্রামে নেই। হোটেলে খাওয়া দোষের নয়, ইউরোপের লোকে সকলেই হোটেলে খায়, তাদের দেশে সব চেয়ে ভালো সুখাদ্য হোটেলেই মেলে। কিন্তু আমাদের দেশে তেমন নয়, এখানে অধিকাংশ স্থলেই কুখাদ্য মেলে। তার কারণ আমরা সস্তায় মুখরোচক জিনিসই সেখানে খেতে চাই। তাই এই দেশেই হোটেলে খেয়ে অনেকের হজমযন্ত্র বিকল হয়। তা ছাড়া গুরুভোজন, অতি ঝাল ও অতি গরগরে ব্যঞ্জনাদির প্রতি লোভ, রকমারি সামগ্রীর প্রতি লোভ, ময়রার দোকানের জলখাবারের প্রতি লোভ ইত্যাদি আরো অনেক কারণ থেকেই আমাদের হজমযন্ত্র বিগড়ায়। বিশেষত এই ডিস্‌পেপ্‌সিয়া এমন রোগ যে, একবার ধরলে আর নিস্তার নেই, সারাজীবনের সাথী হয়ে থাকবে। তখন হাজার সাবধান হলেও তা ছাড়তে চাইবে না। অতএব আমাদের পক্ষে ঐরূপ অত্যাচারী না হয়ে নিয়মিত খাওয়া ও খাওয়ার সেইরূপ ব্যবস্থা করাই কি উচিত নয়?

এর পরে বলতে হয় ডায়েবিটিস বা বহুমূত্র রোগের কথা। এটি সর্বসাধারণের রোগ নয়, যাদের দৈহিক মেহনত করতে হয় আর প্রয়োজনের বেশি খাবার সংস্থান যাদের নেই, তাদের মধ্যে এ রোগ জন্মায় না। অবস্থাপন্ন যারা, খায় বেশি ও খাটে কম, ভাত, আলু ও মিষ্টান্ন যারা কিছু বেশী মাত্রার খেয়ে থাকে, তাদেরই শরীরে এ-রোগ

দেখা দেয়। শর্করাজাতীয় খাদ্যকে হজম করবার জন্য যে প্যাংক্রিয়াস যন্ত্রটি আমাদের আছে, অতিরিক্ত শর্করার চাপে সেটি বিকল হয়ে পড়ে। শর্করা-ইন্ধন ব্যয় হয়ে যেতে পারে দৈহিক পরিশ্রমে, কিন্তু যেখানে তেমন ব্যয় নেই, অথচ কেবলই ইন্ধন গিয়ে জমছে সেখানেই ঘটে এই বিপত্তি। তবে গোড়া থেকে সতর্ক হলে এ রোগ সেরেও যেতে পারে। যাদের বংশে এ-রোগ আছে তাদের পক্ষে খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক প্রথম থেকেই হওয়া উচিত।

তারপর বাত রোগের কথা। মধ্য-বয়সে এ-রোগ অনেকেরই হতে দেখা যায়। হাঁটুতে বাত, কোমরে ব্যথা, কাঁধে ব্যথা, হাতে পায়ে গাঁটে গাঁটে ব্যথা ইত্যাদি। যারা প্রচুর হেঁটে বেড়ায়, রীতিমত খাটাখাটুনি যাদের করতে হয় তাদের এ-রোগ খুব কম হয়। যারা বসে থাকতে ও বসে বসে কাজ করতে অভ্যস্ত, তাদের মধ্যেই হয় বেশি। তা ছাড়া যারা মাংস ডিম প্রভৃতি খাদ্য খেতে অভ্যস্ত তাদের মধ্যে প্রায়ই এ রোগটি জন্মায়। মূত্র পরীক্ষায় সে দোষ ধরা পড়ে। আমাদের দেশে মাংস ডিম প্রভৃতি বেশি মাত্রায় খাওয়া ঠিক নয়, বিশেষত যাদের হাঁটাহাটির পরিশ্রম আদৌ নেই। পৃথিবীতে এমনও দেশ আছে যেখানে মাংস ছাড়া মানুষের অন্য কোনো খাদ্যই প্রায় নেই, যেমন এস্‌কিমোরা বা সু-উচ্চ হিমালয়ের অধিবাসীরা। কিন্তু তাদের তেমনি এত বেশি পরিশ্রম করতে হয় যে, আমরা তার কল্পনাই করতে পারি না। সমতলভূমিতে আমাদের এই গরম দেশে স্থানোপযোগী খাদ্য খাওয়াই শ্রেয়। যাঁদের মাংস না হলে চলে না, তাঁরা অবশ্যই তা খাবেন, কিন্তু অল্প পরিমাণে। পরিমাণ যদি অল্প হয়, তাহলে তাতে কোনো ক্ষতি হয় না, বেশি মাত্রায় খেলেই যত কিছু বিপত্তি ঘটে।

ব্লাড্‌প্রেসার রোগটি আজকাল আমাদের মধ্যে খুব প্রবল হয়ে উঠেছে, এটি প্রায়ই শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে হতে দেখা যায়। অনেকে

মনে করেন এ বুঝি রক্তেরই কোনো দোষ, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়, এর মানে রক্তবাহী শিরাগুলির চাপবৃদ্ধি। কৃত্রিম ধরনের জীবনযাপনই এ রোগের প্রধান কারণ। অতিভোজন, অতিরিক্ত চা-পান ও ধূমপান, পরিশ্রম ও বিশ্রামের মধ্যে সঙ্গতির অভাব, আর বিশেষ ক'রে নিয়মিত অঙ্গচালনার অভাব, এইসব দোষ থেকে রোগটি জন্মায়। যে দেহযন্ত্রটির ভার আমাদের উপর দেওয়া হয়েছে তাকে নিয়মিত চালু রাখলে সহজে বাতেও ধরে না, আর ব্লাড্‌পেসারও বাড়ে না। এই কারণেই এখনকার সভ্য মানুষদের প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু ব্যায়ামের অভ্যাস রাখা উচিত। ইউরোপের লোকেরা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ব্যায়াম অথবা খেলাধূলার অভ্যাস রাখে, তাতেই ঘোর আমিষাশী হয়েও তারা সুস্থ থাকে। আমাদের দেশে যখন তেমন ব্যবস্থা নেই, তখন প্রত্যেকেরই অন্তত দু'চার মাইল প্রত্যহ হেঁটে বেড়ানো দরকার। তাতেও কিছু ব্যায়াম হয়, বিশেষত যাদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে মস্তিষ্ক চালনার মাত্রাটাই বেশি, অঙ্গ-চালনার মাত্রা খুব কম। যেমন করেই হোক, দেহের মাংসপেশীগুলিকে প্রত্যহ খানিকক্ষণ সাবলীল রাখলে অর্থাৎ শরীর ঘামানোর মতো পরিশ্রমের অভ্যাস রাখলে এমন রোগ সহজে জন্মাতে পারে না। আর যাদের এ রোগ হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাদের কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। তামাক এব' চা, এ-দুটি জিনিস একেবারেই যদি পরিত্যাগ করা যায়, তবে তাতেই ব্লাড্‌প্রেসার আশ্চর্যভাবে অনেকখানি কমে যায়। দ্বিতীয়ত খাওয়ার মাত্রা খুব কমিয়ে দিলে তাতেও যথেষ্ট সুফল হয়। মাঝে মাঝে উপবাস দেওয়া, একাদশী, পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথি পালন করা, সেই দিনটা কেবল ফল খেয়েই কাটিয়ে দেওয়া, এই নিয়মে চললে তাতে খুবই কাজ হয়। এতে নুন খাওয়ার মাত্রাও কমানো উচিত।

আজকাল হার্টের রোগ প্রায়ই হতে দেখা যাচ্ছে। সম্পূর্ণ সুস্থ

এবং কার্যক্ষম মানুষরাও নানারূপ হার্টের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। হঠাৎ করোনারি থ্রম্বোসিস হয়েও মৃত্যুর কথা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। এর কারণও খুব সম্ভবত এখনকার নিত্য উদ্বেগপূর্ণ কৃত্রিম ধরনের জীবন-যাপন, তবে এর সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। কেউ কেউ বলছেন যে, তেল-ঘি-প্রযুক্ত খাদ্য বেশি পরিমাণে খাওয়াই এর নৈমিত্তিক কারণ। হার্টের মাংসপেশীতে অত্যধিক চর্বি জমাও একটি কারণ হতে পারে। তবে মোটের উপর বলা যায় যে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপন করলে, পরিমিত আহার করলে, অতিরিক্ত তেল-ঘি-প্রযুক্ত গুরুপাক খাদ্য বর্জন করলে, আর কিছু মৃদু ধরনের ব্যায়ামের চর্চা রাখলে হার্ট যন্ত্রটি সহজে বিকল হয় না।

আরো একটি রোগ কোনো কোনো ব্যক্তিকে প্রায়ই খুব কষ্ট দেয়, তা হলো হাঁপানি রোগ। কারো কারো হাঁপানির ধাত আছে। মাঝে মাঝে প্রায়ই তারা সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হয় এবং তার পরেই হাঁপানি ধরে। এ রোগ মারাত্মক না হলেও বিলক্ষণ কষ্টদায়ক। প্রায়ই দেখা যায় যে, এটা বংশানুক্রমিকভাবে চলে আসছে। কিন্তু তথাপি সমুচিত ব্যবস্থার দ্বারা এ রোগকে নিবারণ করা একেবারেই দুঃসাধ্য নয়। ফাঁকা বাতাসে শোওয়া অভ্যাস করা এর পক্ষে সব চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা। যারা এই অভ্যাস করেছে তারা তীব্র শীতের মধ্যেও দরজা জানালা বন্ধ ক'রে শোয় না, ফাঁকাতেই শোয়। এই অভ্যাসের দ্বারা অনেকেই এই রোগটি থেকে আশ্চর্যরূপে রেহাই পেয়ে যায়। দ্বিতীয় উপায় কিছু শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম অভ্যাস করা, যাকে আমরা প্রাণায়াম করা বলে থাকি। এ-যে ঠিক শাস্ত্রমতেই করতে হবে তার কোন মানে নেই, আসল কথা হলো সুদীর্ঘ প্রশ্বাস নিয়ে সুদীর্ঘকাল শ্বাসরোধ ক'রে থেকে ধীরে ধীরে নিশ্বাস পরিত্যাগ করা। এই ব্যায়ামের দ্বারা শ্বাসযন্ত্রের অনেক রোগকেই নিবারণ করা যায়।

নেশার বশে

কোনো রকমই নেশার বশে যাওয়া ভালো নয়। কিন্তু নেশা বলতে কি বোঝায় সেই কথাটাই আগে স্পষ্টরূপে জানা দরকার। নেশা বলতে আমরা সাধারণত বুঝি, কোনো একটা বিশেষ বস্তু সম্পর্কে বদ-অভ্যাস। কিন্তু অভ্যাস ও নেশার মধ্যে অনেকখানি তফাৎ আছে। অভ্যাস জিনিসটা আমাদের শরীর ধারণের পক্ষে নিতান্তই দরকার, তাই আমরা আহার, নিদ্রা প্রভৃতি বিষয়ে একটা নিয়মিত অভ্যাসকেই অনুসরণ করে চলি। ওতে আমাদের উপকারই হয়। কিন্তু নেশা হলো অনিষ্টকারী অভ্যাস। এমন কতকগুলি নেশার দ্রব্য আছে যা এমনিতে বিশেষ অনিষ্টকারী নয়, কিন্তু যখনই আমরা তাতে অতি অভ্যস্ত হয়ে পড়ি তখনই তা হয় অনিষ্টকারী। এক আধ পেগ্ ব্র্যাণ্ডি বা হুইস্কি ইউরোপ, আমেরিকার লোকেরা ভোজে উৎসবে ও যখন তখন অনেকেই পান ক'রে থাকেন, তাতে কোনই অনিষ্ট হয় না, কিন্তু যেমনি অভ্যস্ত রূপে মদ্যপায়ী হয়ে পড়া যায় অমনি তা অনিষ্টকারী হয়ে দাঁড়ায়। দৈনিক কয়েকটা সিগারেট খেলে তাতেও কোনো বিশেষ অনিষ্ট হয় না, কিন্তু নিত্য সিগারেট খেতে অভ্যাস হলে, যাকে বলে চেইন স্মোকার, তাতে অনিষ্ট হতে শুরু করে, কিন্তু তা তখন ঘোরতর নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। এইরূপ আরো অনেক জিনিস আছে যা এমনিতে অনিষ্টকারী হয় না, কিন্তু সাধারণ বাহারের গণ্ডী পার হয়ে নেশার পর্যায়ে গিয়ে পড়লেই তখন তা আমাদের পক্ষে ঘোরতর অনিষ্ট-কারী হয়ে ওঠে। কিন্তু এর কারণ কি? একটাই জিনিস, কখনো বা ক্ষতিকর নয়, কখনো বা ক্ষতিকারক হয় কেন?

কারণ রয়েছে আমাদের নিজেদেরই দেহপ্রকৃতির মধ্যে। দেহ-

প্রকৃতি আপন গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট মাত্রাতে সীমাবদ্ধ। সেই বিশেষ সীমাকে সে কোনোমতেই লঙ্ঘন করতে পারে না। এই সীমার মাত্রা পরিচয় আমরা আমাদের সাধারণ জীবন-যাপনের মধ্যেও প্রতিক্ষেত্রেই পেয়ে থাকি। এই সীমা সকলের পক্ষে সমান নয়, প্রত্যেকের পক্ষেই বিভিন্ন। খাদ্যের সম্পর্কেও ভাত কতটা পর্যন্ত খাওয়া আমার দ্বারা চলতে পারে তা আমি নিজে জানি, তার চেয়ে বেশী ভাত খেলেই আমার অসুখ হবে। শুধু খাদ্যের বিষয়ে নয়, অন্যান্য অনেক বিষয়েই তাই। আফিম অল্প মাত্রায় খেলে কোনো ক্ষতি হয়না, বরং যন্ত্রণাদিতে যথেষ্ট উপকার করে, কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই তা বিষ। সুরা প্রভৃতির পক্ষেও সেই কথা ; অল্প মাত্রায় তা শরীরে স্ফূর্তি আনে, কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই মত্ততা আনে। কিন্তু এ তো গেল এক রকমের সীমা ; এ ছাড়া আবার অপর রকমের সীমা আছে। সেটা বিশেষ ক'রে ঐ নেশার দ্রব্যগুলির সম্পর্কে। নেশার অভ্যাস করলে তাতে কিছুকাল পর্যন্ত সুখেই কাটিয়ে দেওয়া যায়, কোনোই ক্ষতি শরীরে হয় না। এমনকি তখন অল্পে অল্পে যদি মাত্রা বাড়াতে থাকা যায়, তাতেও কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু কিছুকাল পরে হঠাৎ এক সময় থেকে শরীরে ক্ষতির ও অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে। অবশ্য ধরতে পারা যায় না যে, কিসের কারণে তা ঘটল। তাই নেশার দ্রব্যটিকে ছাড়বার কথা তখন মনেও হয় না। কিন্তু দেহপ্রকৃতির মধ্যে তখন ঐ দ্রব্যটির সম্বন্ধে সহ্যের সীমা পার হয়ে গেছে। দেহপ্রকৃতি তখন ঐ বস্তুটিকে আর নির্বিবাদে কোনোমতে মেনে নিতে পারছে না, সে ওর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করতে শুরু করেছে। কাজেই শরীরে নানারূপ বিপত্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এই সীমাও সকলের পক্ষে সমান নয়, প্রত্যেকের পক্ষেই বিভিন্ন। কেউ বা সারাজীবন ধরেই একটা কোনো নেশা চালিয়ে যেতে পারলে, তাতে

ক্ষতি খুব বেশী কিছু হলো না। কিন্তু কারো পক্ষে হয়তো তেমন সৌভাগ্য হলো না, দুই, চার বা দশ বছর পরে বিষ-লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে শুরু করল। অথচ নেশায় তাকে তখন রীতিমতই ধরেছে। ডাক্তার ছাড়তে বল্‌লেও তা ছাড়বার উপায় নেই, নিজে ইচ্ছা করলেও ছাড়বার উপায় নেই, সে তখন সেই নেশাটির ক্রীতদাস হয়ে পড়েছে। নেশার নির্দিষ্ট সময়টিতে তাকে সে নেশা করতেই হবে—এখন তো বাঁচি, তার পরে দেখা যাবে। কিন্তু সে কী প্রাণান্তকর বাঁচা! এই কারণেই চিকিৎসকেরা বলে থাকে যে, কোনো নেশার বশে কোনো মতেই যাওয়া উচিত নয়। কয়েক রকমের দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে যে, এই উপদেশের গুরুত্ব কতখানি।

আফিমের নেশার সম্বন্ধে অনেকানেক গুণগান শুনতে পাওয়া যায়। ওতে নাকি পরমায়ু বেড়ে যায়, দেহে রোগপীড়া হবার সম্ভাবনা কমে যায়, সুস্থ দেহে ও স্বচ্ছন্দ মনে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায় ইত্যাদি। কথাটার মধ্যে যে একেবারেই কিছু সত্য নেই এমন নয়। কিন্তু বস্তুত কেবল কারো কারো পক্ষেই ঐ কথা খাটে, সকলের পক্ষে নয়। ইতিপূর্বে ঐ যে বলেছি সীমার ব্যাপার, এখানেও তাই। আফিম খেতে বা অন্যরূপে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়েছেন এমন অনেকেরই কথা আমরা জানি। অমৃতবাজারের মৃণালকান্তি ঘোষ আফিম খেয়ে সুস্থ শরীরে দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন। পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ প্রত্যহ আপন দেহে মর্ফিয়া ইন্‌জেকশন নিতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, তিনি শতায়ু অতিক্রম করেছিলেন এবং শেষ বয়সেও তাঁর পাণ্ডিত্য ও স্মৃতিশক্তি অটুট ছিল। হাস্য-সাহিত্যিক অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় আফিম খান এবং ছিয়াত্তর বছর বয়সেও তিনি রীতিমত সক্ষম আছেন, কয়লার দোকানে ভারী কয়লার বোঝা মুটের মাথায় তুলে দেন। কিন্তু যেমন এই সব দৃষ্টান্তও রয়েছে, তেমনি অন্য দিকের দৃষ্টান্তও অনেক আছে। শরৎবাবু

আফিমের খুব প্রশংসা করতেন, যখন তখন আফিম খেতেন, কিন্তু নানা রোগে ভুগে তিনি অকালেই মারা গেলেন। আর একজনের কথা জানি, আফিম খাওয়ার দরুনই তাঁর শরীরে নানারকম রোগ প্রবেশ করেছিল। তাঁকে কিছুতেই যখন আফিম ছাড়ানো গেল না তখন বাড়ির লোকদের চুপি চুপি বলে দেওয়া হলো, আফিমের সঙ্গে ময়দা মিশিয়ে দাও, ক্রমশ ময়দার ভাগ বাড়িয়ে আফিমের ভাগ কমিয়ে আনো। এমনি করে আফিম খুব কমিয়ে রোগগুলি তাঁর সেরে গেল। কিন্তু যেমনি তিনি জানলেন এই ফাঁকির কথা, অমনি অস্থির হয়ে নিজে আফিম কাছে রেখে নিজে খেতে শুরু করলেন। অতঃপর আবার রোগ দেখা দিল, অকালে তিনি তাতেই মারা গেলেন। আরো একজনের কথা জানি, পেটের কলিক্ বেদনার জন্য তিনি আফিম ধরেছিলেন। পরে অত্যন্ত দরিদ্র হয়ে পড়লেন, কিন্তু আফিমটি আর ছাড়তে পারেন না। আফিমের এখন অনেক দাম, পাঁচজনের কাছে ভিক্ষা ক'রে তাঁকে আফিম কিনতে হয়, রোগজীর্ণ শরীর নিয়ে পরের গলগ্রহ হয়ে পদানত হয়ে থাকতে হয়। এক সময় তিনি ছিলেন বড়ো দরের শিল্পী, সে-সব এখন তাঁর ঘুচে গেছে, কিন্তু তবু এই আফিমটি তিনি ছাড়তে পারেননি। অনেক কষ্টেই জীবন কাটাচ্ছেন। অতএব দৃষ্টান্ত দুই রকমেরই আছে। আফিম যে শরীরের স্নায়ুগুলিকে দাবিয়ে রাখে এ কথা ঠিকই, তাতে সহজে স্নায়ুবিকার জনিত রোগাদি আসতে দেয় না তাও ঠিক কথা, কিন্তু সে যে তোমাকে তার ক্রীতদাস ক'রে রাখবে তাতেও কোনো ভুল নেই। তা ছাড়া মাত্রা ওর চিরকাল একরকম থাকবে না, ক্রমশ বাড়াবার দিকেই মন যাবে, আর বাড়ালেই তখন বিষক্রিয়ার বিপদ আছে। অনেকে হয়তো ভাববেন যে আমরা আফিমের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা করছি। তা নয়, কেবল এইটুকু বলতে চাই যে, ওটা নেশারই জিনিস এবং অনিষ্টকারী,—যাঁরা নেশাতে

অভ্যস্ত তাঁরা যেন এটা যথাসাধ্য কমিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেন, আর যাঁরা ধরেননি তাঁরা কখনো যেন এ নেশা না ধরেন।

তারপর ধরুন তামাকের কথা। তামাকও নেশার জিনিস, তার সকল রকমের ব্যবহারই অনিষ্টকারী হতে পারে।

প্রত্যেকের পক্ষেই যে তা হবে সে কথা অবশ্য ঠিক নয়। এমনকি যারা চেইন স্মোকার তাদের কারো কারো পক্ষে ক্ষতি না হতেও পারে। আবার কারো কারো পক্ষে ওতে বিষম ক্ষতি হতেও পারে। তার কারণ হলো ঐ দেহপ্রকৃতির সীমা। তামাকের মধ্যে যে নিকোটিন থাকে তাকে দেহপ্রকৃতি খানিকদূর পর্যন্ত সহ্য করে নিতে পারে, কিন্তু যেমনি সহ্যের সীমা তার পার হয়ে যায়, অমনি আর সামান্য নিকোটিন সে বরদাস্ত করতে পারে না। তখনই দেখা দেয় বিশ্রী রকমের কাসি, হার্টের দুর্বলতা, নার্ভের দুর্বলতা ইত্যাদি। তখন নিকোটিনের সংস্পর্শ একেবারেই ত্যাগ করতে হবে, শুধু কমিয়ে দিয়ে কোনো ফল হবে না। সামান্যমাত্র তামাকেই তখন অনিষ্ট করতে থাকবে। পান-জর্দার এবং নস্যি প্রভৃতির সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। কেউ হয়ত সারাজীবনই বেশ কাটিয়ে দিলে, কিন্তু কারো আবার হার্টের দোষ দেখা দিল, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া দেখা দিল। যার এই সব উপসর্গ দেখা যাচ্ছে তাকে সুস্থ হতে হলে নেশা ছাড়তেই হবে। নতুবা শরীরযন্ত্রের মধ্যেনানা রকমের দোষ দেখা দিতে শুরু করবে। তখন এই নেশার সপক্ষে যতই যুক্তি দেখান যাক, তাতে কোনো কাজ হবে না।

মদের নেশার বেলাতেও ঐ একই রকমের কথা। অনেকেরই জীবনের ইতিহাস নিয়ে দেখা গেছে যে, হয়তো তাঁরা দশ পনেরো বছর পর্যন্ত নির্বিবাদে এ নেশা চালিয়ে গেছেন, কোনোই ক্ষতি হয়নি। তার পরে হঠাৎ লিভার বিগড়োতে শুরু করল। যাঁরা তৎক্ষণাৎ ভয় পেয়ে এ নেশা ত্যাগ করলেন তাঁরা বেশ সামলে নিলেন। কিন্তু যাঁরা ছাড়তে

পারলেন না কিংবা একেবারে না ছেড়ে মাত্রা কমিয়ে দিলেন, তাঁরা তাতেও আর সুস্থ হতে পারলেন না। নানা চিকিৎসার দ্বারা যদিবা লিভারকে সারিয়ে নেওয়া গেল তো দেখা দিতে থাকল বহু প্রকার স্নায়ু-বিকৃতি। হাতে পায়ে দুর্বলতা, ঝিনঝিনি, নিউরাইটিস, হাতপায়ের কাঁপুনি, আরো বহুবিধ লক্ষণ। তখন অ্যালকোহলের মাত্রা যতই কমিয়ে দেওয়া যাক্ তাতে কিছু কাজ হবে না। এ নেশা সম্পূর্ণরূপেই তখন ছাড়তে হবে, এক বিন্দুও পান করা চলবে না। দেহপ্রকৃতির নির্দিষ্ট সহ্যসীমাটি সেখানে পার হয়ে গেছে, বাঁচতে হলে ও জিনিস ছাড়া ভিন্ন গতি নেই।

আরো অন্যান্য বহু রকমের নেশার বস্তু আছে, কিন্তু সেগুলির উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ সকল রকম নেশারই এক গোত্র। প্রথমে অনিষ্টকারী নয়, কিন্তু সীমা পেরোলেই অনিষ্টকারী, আর সেই সীমা কার যে কেমন হবে তার কোনো ঠিক নেই। কিন্তু শেষকালে বলতে বাকী রইল চায়ের নেশার কথা। চা নেশার দ্রব্য নয়, খাদ্য তালিকারই অন্তর্ভুক্ত। মাত্রার সীমা বজায় রাখলেই এটি খাদ্যই থাকে, কিন্তু মাত্রা অতিক্রম করলে তখন নেশায় পরিণত হয়। তখন বারে বারেই চা খেতে ইচ্ছা হয়; ঘুরতে ফিরতে দৈনিক অনেক-বারই এক কাপ ক'রে চা খাওয়া চাই, নতুবা কাজে স্ফূর্তি মেলে না, একদিন বা একবেলা যদি চা না মিলল তো সর্বনাশ উপস্থিত হয়। তখন মাথা ধরে, গা ব্যথা করে, শরীর অস্থির করে। এক কাপ চা পেলেই অমনি সব সেরে যায়। চা তখন নেশায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার পরে কোনো এক দিন এসে পড়ে ঐ সীমার প্রশ্ন। দেহ-প্রকৃতির সহ্যের সীমা যেদিন পার হয়ে যায় সেদিন থেকে দেখা দিতে শুরু করে ওর বিষমক্রিয়া। তখন দেখা দেয় বুক ধড়ফড়, দেখা দেয় স্নায়ুদৌর্বল্য। পরম উপাদেয় এই খাদ্য বস্তুই তখন বিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অতএব কোনো জিনিসই দোষের নয়, কিন্তু কোনো জিনিসকে নেশায় পরিণত করাই দোষের। এইটুকু যদি স্মরণ রেখে চলা যায় তাহলে কোনো কিছুতেই আমাদের অনিষ্ট করতে পারে না।

খাওয়ার কমবেশী

বুদ্ধের জীবনীতে দেখা যায় যে, সেকালে প্রসেনজিৎ নামে একজন বহুভোজী রাজা ছিলেন, তিনি বহু প্রকারে বহু খেতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু প্রত্যহ গুরুভোজনের পরেই তাঁর দারুণ অস্বস্তি হতো। একদিন এমন অতি ভোজনের পরে বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তিনি দেহের কষ্টের জন্য অস্থির হয়ে পায়চারি করতে থাকলেন। তাঁর শুয়ে পড়বার ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু বুদ্ধের সামনে তা সম্ভব নয় বলে অতঃপর সেখানেই ক্লান্ত চোখে একপাশে বসে পড়লেন। তাঁর এমনি ভাবগতিক দেখে বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন—"মহারাজ কি অসুস্থ?" প্রসেনজিৎ বললেন—"তা নয়, তবে আহারের পরে আমার রোজই এমনি অস্বস্তি হয়।" বুদ্ধ তাঁকে বুঝিয়ে বললেন—"এটা হলো অতি ভোজনের কুফল। অলস ও বহুভোজী হলেই তাকে বিশাল দেহ শূকরের মতো গড়াগড়ি খেতে হয়, তার দুঃখের অন্ত থাকে না। ভোজনে মিতাচারী হওয়া উচিত, তাতে শরীরের আরাম হয়, বিলম্বে জরা আসে, আর প্রাণও বাঁচে। মাত্র এক মুঠো চালের যে ভাত হবে তার বেশী তুমি আহার করবে না।" এই উপদেশ পালন করে প্রসেনজিতের শরীর প্রফুল্ল রইল ও তাঁর দেহের চর্বি কমে গেল। তখন তিনি বুদ্ধের কাছে গিয়ে বললেন—"এখন আমি সুখে আছি, আবার মৃগয়াতেও যেতে পারি।" বুদ্ধ তাই শুনে বললেন—"মহারাজ স্বাস্থ্যই জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ।"

এটা সত্য ঘটনা বলে বর্ণিত আছে। বুদ্ধ নিজেও এই সুখে সুখী ছিলেন। তিনি দিনে একবার মাত্র আহার করতেন, তার আগে বা পরে কিছুই খেতেন না। এমনি মিতাহারী থেকে তিনি সুস্থ দেহে দীর্ঘ

আশী বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। ভিক্ষায় যা মেলে আর অপরে যা খেতে দেয় তাই খেতে হতো বলে মাঝে মাঝে তাঁর পেটে শূল ব্যথা ধরেছিল বটে, কিন্তু তদ্ভিন্ন আর কোনো রকম অসুস্থতার কথাই শোনা যায়নি। এমন কি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি যথারীতি ভিক্ষায় বেরিয়েছিলেন।

আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যেও আগে এমনি নিয়ম ছিল। তাঁরা অনেকেই বহুভোজন ও বহুবার ভোজন করতে অভ্যস্ত হতেন না। বিধবাগণ তো বাধ্য হয়েই একাহারী থাকতেন, কিন্তু আমাদের মা দিদিমাদেরও সধবা অবস্থাতেই একাহারী থাকতে দেখেছি। সকলের খাওয়াদাওয়া চুকে যাবার পর প্রায় অপরাহ্ণের সময় তাঁরা খেতেন মাত্র একবার, তারপরে আর নয়। এ-ছাড়া প্রতি মাসে চার পাঁচদিন উপবাসের পালা তো ছিলই—নানা বারব্রত ও লক্ষ্মীপূজা প্রভৃতির ব্যাপারে কতদিন আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি যে এঁরা এমন প্রায়ই না-খেয়ে বাঁচেন কেমন ক'রে। কিন্তু বাস্তবিকই দেখা যেত যে ঐ ভাবে থেকে তাঁদের শরীরে কোনো অসুখবিসুখ ছিল না, আর তাঁদের সুদীর্ঘ পরমায়ু ছিল। আমরা মনে করতাম তাঁরা বুঝি 'না-খেয়ে' বেঁচে থাকার কিছু মন্ত্র জানেন, কিন্তু তা নয়, ঐ একাহার ও মাঝে মাঝে উপবাসাদির দ্বারাই দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে শরীরকে সুস্থ রাখা যায়, সেই গুপ্তকৌশলটি তাঁরা শিখে নিয়েছিলেন।

এখনকার মেয়েরা অবশ্য এরূপ নিয়ম পালন করেন না। তাঁরা অতি ভোজনে এবং বহুবার ভোজনে অভ্যস্ত হন, আর উপবাসাদি করা আজকাল ছেড়েই দিয়েছেন। তারপর থেকে মেয়েদের মধ্যে ডায়েবিটিস, হাই ব্লাডপ্রেসার, হার্টের গোলমাল, বাতের পীড়া প্রভৃতি এমন কতকগুলি রোগ দেখা যাচ্ছে যা আগেকার মেয়েদের মধ্যে ছিলই না। পুরুষেরা ঐ সকল রোগে ভুগতেন বটে, কিন্তু মেয়েরা নয়।

আমাদের কথায় ভুল বুঝবেন না, আমরা বলছি পরিণত বয়সের মেয়েদের কথা। কিন্তু যাদের বয়স অপরিণত সেই সব কিশোরী ও স্কুলকলেজের ছাত্রীদের মধ্যে এখন কিন্তু প্রায়ই এর উল্টো রকমের আচরণ দেখা যায়। তাঁরা স্লিমিং করবার জন্য খুব কম খেতে অভ্যাস করেন। কোনো কিছুতেই যেন রুচি নেই, দুই এক গ্রাস মাত্র খেয়েই উঠে পড়েন। এটা তাঁরা ইচ্ছাপূর্বক অভ্যাসেই দাঁড় করিয়ে নেন। উদ্দেশ্যটা এই যে, শরীর যেন একটুও মোটা হতে না পারে, বরাবর রোগা ছিমছিমে হয়ে থাকে। তাহলে তো এঁদের স্বাস্থ্য খুবই ভালো থাকা উচিত, যখন কম খেলেই শরীর ভালো থাকবার কথা আমরা বলছি। কিন্তু এঁদের বেলা দেখা যায় যে, তা হয় না, এঁদের স্বাস্থ্য প্রায় খারাপই হয়ে থাকে। আর ক্ষয়রোগ প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি যত এঁদের মধ্যেই হতে দেখা যায়।

তবে কি বেশি খাওয়াও দোষ, আবার কম খাওয়াও দোষ? তা নয়, এখানে বয়সের ভাগাভাগি ক'রে নিয়ে এ বিষয়ের বিচার করতে হবে। আসল কথাটা এই যে, বেশি বয়সের পক্ষে বেশি খাওয়া অনিষ্টকারী, আর কম বয়সের পক্ষে কম খাওয়া অনিষ্টকারী। বয়স যখন কম থাকবে খাওয়া তখন বেশি হওয়া দরকার, বয়স যখন বেড়ে যাবে খাওয়া তখন কমে যাওয়া দরকার। এই হলো স্বাস্থ্যের নির্দেশ। আমরা এই বিষয়েই ভুল বুঝি। মনে করি যে, বাচ্চাদের অল্প খেলেই চলে যায়, কারণ তাদের ঐটুকু তো দেহ, কিন্তু আমাদের কিছু বেশি পরিমাণে না খেলে এতবড় দেহটা টিঁকবে কেমন করে?

এখানে একটা উপমা দিয়ে বললে ঐ ভ্রান্তিটা দূর হয়ে যাবে। আমাদের দেহগঠনের সঙ্গে একটা ইমারত গঠনের তুলনা দেওয়া যাক। ইমারত যখন প্রথম গড়তে শুরু করা হয়, তখন বিস্তর ইঁট, কাঠ ও মালমসলার দরকার হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সেটি গড়ে তোলা না হয়,

ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ সব মালমসলা প্রচুর পরিমাণে যোগান দিতে থাকতে হয়। কিন্তু সবটা গড়া শেষ হয়ে গেলে তার পর থেকে আর অত মালমসলা এনে ঘর বোঝাই করবার দরকার নেই, কেবল মেরামতির জন্য কিংবা একটু আধটু অদলবদলের জন্য কিছু কিছু জিনিস দরকার হবে, তার বেশি এনে জড়ো করলে বাড়ি আবর্জনাস্তূপে পরিণত হবে। এখানেও সেই কথা। শৈশব থেকে শুরু ক'রে পরিণত যৌবনকাল পর্যন্ত আমাদের দেহ গঠনের কাজ এগিয়ে চলেছে, তখনও তা সম্পূর্ণ হয়নি। খাদ্যই সেই দেহ-ইমারতের ইট কাঠ প্রভৃতি মালমসলা, তাই হলো দেহ গঠনের প্রয়োজনীয় উপাদান। যতকাল পর্যন্ত গঠন সম্পূর্ণ না হয় ততকাল পর্যন্ত বেশি পরিমাণেই খাদ্যের যোগান দিতে হবে, নতুবা গঠনের কাজ তেমন পোক্ত হবে না। তখনকার কালের মধ্যে স্লিমিং করবার প্রচেষ্টার মতো মারাত্মক ভুল আর কিছুই নেই। কিন্তু যৌবনের শেষে দেহের পরিণতি যখন পুরোপুরি এসে গেল, যখন নতুন ক'রে গড়ে তোলবার কিছুই আর বাকী নেই, তখন খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে ফেলতে হবে বৈকি, নতুবা দেহ আবর্জনা-স্তূপে পরিণত হবে, অর্থাৎ অযথা মেদ-বৃদ্ধি হতে থাকবে। আমাদের দেহ অবশ্য ইটের ইমারতের মতো জড়বস্তু নয় যে, মাঝে মাঝে একটু আধটু ভাঙাচোরা ছাড়া তার কোন ক্ষয় নেই। ওর তুলনায় আমাদের দেহের উপাদানগুলির প্রত্যহই কিছু ক্ষয় হচ্ছে, তাই সেই ক্ষয়ক্ষতির পূরণের জন্য প্রত্যহই আমাদের খাদ্য খাওয়া চাই। কিন্তু ক্ষতিপূরণের খাদ্য, আর ছোটো থেকে বড়ো ক'রে গড়ে তোলবার খাদ্য কখনো এক রকমের হতে পারে না। এই কথাটিই আমাদের এবং বিশেষ ক'রে এখনকার মেয়েদের ভালো ক'রে বোঝা দরকার।

একটা মোটামুটি আন্দাজ করবার জন্যে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ত্রিশবছর বয়সের মধ্যেই দেহের গঠনের সব কাজ শেষ হয়ে যায়,

তার পরে আর নতুন ক'রে গড়ার কিছুই থাকে না। সুতরাং ঐ বয়স পর্যন্ত বেশী করেই খেয়ে যেতে হবে। তার মানে যে কুঁচ্‌কিকণ্ঠা হয়ে খেতে হবে এমন কথা নয়। তবে খাদ্যের পরিমাণ কমালে চলবে না, পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া বাদ দিলে চলবে না। দুধ ঘি মাছ মাংস ডিম ফল শাকসবজি প্রভৃতি উপযুক্ত পরিমাণেই খেতে হবে, যার যেমন জোটে। তখন প্রত্যহ চারবার খেতেও দোষ নেই, বরং তাই খাওয়াই উচিত। নিজের প্রয়োজন বুঝে এবং খিদে বুঝে যদি খাওয়া যায় তবে তাতে অনাবশ্যক মেদবৃদ্ধিও হয় না, যদি সেই সঙ্গে অঙ্গ-চালনার কিছু পরিশ্রম থাকে।

কিন্তু ত্রিশ বছর বয়সের পর থেকে খাদ্যের পরিমাণ কমানোর দিকে মন দেওয়া উচিত। তখন থেকেই খিদে রেখে খাওয়ার অভ্যাস শুরু করা উচিত। তা না করলেই দেখা যাবে যে, শরীরে মেদ জন্মাচ্ছে, ভুঁড়ি বেড়ে যাচ্ছে। এইগুলোই আবর্জনা। কোনো প্রয়োজন নেই, অথচ দেহের মধ্যে সঞ্চিত হচ্ছে। তার কারণ আমরা তখনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য খেয়ে যাচ্ছি। দেহযন্ত্র অত উদ্বৃত্ত খাদ্যকে কোনো কাজে লাগাতে না পেরে মেদ ক'রে জমিয়ে রাখছে। তাও বলছি বেশি পরিমাণে খাদ্য খেয়ে যদি শরীর সুস্থ থাকে তবেই। কিন্তু প্রায়ই তা থাকে না। একটা-না-একটা রোগের সৃষ্টি হয়ে পড়ে। হজমের দোষ হওয়া, হাঁস-ফাঁস করা ও বুকের মধ্যে হাঁপ লাগা, এবং আরো অনেক রকমের অসুস্থতা ওতে ঘটতে দেখা যায়। সবগুলোই বেশি বয়সে দেখা দেয়, অল্প বয়সে ওসব কিছুই হয় না। তার একটা প্রধান কারণই ঐ অতিভোজন।

অনেককে বাধ্য হয়ে অতিভোজন উপরোধে পড়ে করতে হয়। প্রাচীন মিসরের ইতিহাসে দেখা যায়, ফারাও রাজারা অনেককে নিমন্ত্রণ ক'রে একশো রকমের খাদ্য সামনে ধরে দিতেন। রাজার মান-

রক্ষা করবার জন্যে প্রত্যেককে সব জিনিসই কিছু কিছু খেতে হতো, কিন্তু তাতেই তাদের সাধ্যাতিরিক্ত হয়ে যেতো। তার পরে তারা প্রত্যেকেই ঘরে ফিরে বমি ক'রে সেগুলো উদ্গীরণ ক'রে ফেলতো। নতুবা তাদের যন্ত্রণার অবধি থাকত না। এখনও অনেকটা তেমনি ভাবে নিমন্ত্রণ খাবার ও খাওয়াবার প্রথা আছে। তাই পেটে না ধরলেও জোর ক'রে খেতে হয়, ভালো ভালো সামগ্রী না খেয়ে নষ্ট করা যায় না। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষের ভেবে দেখা উচিত ওতে নিজের ভালো করছি না মন্দ করছি। খাবার উদ্দেশ্য রসনাতৃপ্তিও নয়, লোকতৃপ্তিও নয়, দেহরক্ষার জন্যেই খাওয়া। সুতরাং সেইদিক দিয়ে যখন যেমন দরকার তখন তেমন পরিমাণেই নিজে বুঝে খাওয়া উচিত।

খাওয়ার মোটামুটি নিয়মটা এই: অল্প বয়সে পেট ভরে খেতে হবে, তখন কম কম খেলে চলবে না। ত্রিশ বছর বয়সের পর থেকে খাওয়া কমানো শুরু করতে হবে। চল্লিশ বছর বয়স হলেই খাওয়া প্রায় অর্ধেক কমিয়ে দেবে। পঞ্চাশ বছরে পড়লে তার চেয়েও কমিয়ে দেবে। তার পরে ক্রমশ যত বয়স বাড়বে, খাওয়াও তত কমবে। তখন খাবার লোভটি যথাসম্ভব দমন করতে হবে। প্রকৃতিও তখন সেই কথাই জানিয়ে দেয়, তাই বেশি বয়স হলেই দাঁত পড়ে যায়।

মেয়েদের পক্ষে মাঝে মাঝে উপবাস দেওয়া খুবই ভালো। চব্বিশ-ঘণ্টার উপবাস না করলেও একবেলার উপবাস অনায়াসে করা যায়। এক একদিন কেবল ফল খেয়ে থাকা (ফলাহার দিবস) এও খুব ভালো ব্যবস্থা। ওতে দেহের মধ্যে আবর্জনা জমা মাঝে মাঝে বিরতি দেওয়া হয়।

চুলের যত্ন

চুলের যত্ন করতে গেলে কেবল চুলের ডগার দিকে নজর দিলে চলে না, গোড়া ধরে টানতে হয়। অতএব ওর গোড়ার কথা নিয়ে আমরাও শুরু করি।

আমাদের মাথায় কত চুল থাকে তা জানেন? বিজ্ঞানীরা তাও গুণে দেখতে ছাড়েননি। মাথার চুলের সংখ্যা হবে মোট এক লাখের কিছু বেশী। ওর প্রত্যেকটা চুল বেশ শক্ত করেই আঁটা আছে, টানলেই যে সহজে উপড়ে আসবে এমন নয়। মাথার চুল বিলক্ষণ ভার বহন করতে পারে। চীন দেশের আগেকার লোকেরা চুল কাটত না, তারা বেণী-বন্ধন করত। তাদের মধ্যে যারা জিম্‌ন্যাষ্টিকের কসরৎ দেখাত তারা অনেক উপরের ট্র্যাপিজে বেণীটা জড়িয়ে বেঁধে শরীরের সমস্ত ভার নিয়ে ঝুলে পড়ত, তার দুই পা ধরে আরো দুজন ঝুলত, এই তিনজনের দেহের ভারেও সেই বেণী ছিঁড়ত না। মাথার চুলের যে এতখানি জোর, সেই চুল যদি আঁচড়াতে গিয়ে ফস্ ফস্ ক'রে উঠে আসে, তাহ'লে মনে দুঃখ হয় বৈকি।

চুলের গজানোর ইতিহাস অনেকটা জানোয়ারদের শিঙ গজানোর ইতিহাসের মতো। চুলের গোড়ায় থাকে এক রকমের কঠিন চর্মকোষ, তার থেকেই চুলের কোষগুলি গজায়। সেই কোষ ক্রমশই নীচের থেকে উপর দিকে ঠেলে উঠতে থাকে, স্তরের পর স্তর। নীচের থেকে উঠে চামড়ার উপরে বেরিয়ে পড়লে তা আর তখন জীবিত থাকে না, সে কোষ তখন মৃত। এই কোষ স্তরের পর স্তর সাজানো হতে থাকে অনেকটা মাছের গায়ের আঁশ সাজানোর মতো। এইভাবে ক্রমশ মাথার চুল লম্বায় বেড়ে চলে। প্রতিমাসে আমাদের মাথার

চুল প্রায় আধ ইঞ্চি করে বেড়ে যায়, কারো কারো তার চেয়ে বেশীও বাড়ে। কিন্তু বাইরের লম্বমান দিকের চুলটা মৃত হলেও তার গোড়ার দিকটা মৃত নয়, সেখানকার কোষ সম্পূর্ণ জীবন্ত এবং অনুভূতি-প্রবণ। সেই চুলের গোড়াতে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাংসপেশী আছে, তারা একত্রে সংকুচিত হতে পারে, শোয়ানো লোমটিকে খাড়া ক'রে তুলতে পারে। তাই ভয় পেলে আমাদের মাথার চুল ও গায়ের রোঁয়া একসঙ্গে খাড়া হয়ে ওঠে বিড়ালের লোম ফোলানোর মতো। সেই গোড়ার দিকে আবার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নার্ভও আছে, তার থেকে চুলের দ্বারাও স্পর্শবোধ আসে। চুলের ডগায় সামান্য কিছু স্পর্শ করলেই তৎক্ষণাৎ তা আমরা টের পেয়ে যাই। তেমনি চুলের গোড়ায় অসংখ্য রক্তশিরাও আছে, তার থেকেই চুলের গোড়া পুষ্টি গ্রহণ করে। আবার একরকম তৈলগ্রন্থিও আছে চুলের গোড়ার দিকে, যার থেকে তেল বেরিয়ে চুলকে চিক্কণ ও নরম রাখে। কোনো চুল যদি জোর করে উপড়ে ফেলা যায় তবে তার গোড়া থেকে আবার নতুন চুল গজায়, কারণ বস্তুত চুলের গোড়াটাই উপড়ে আসে না, যা আসে তা অর্ধমৃত নীচেকার কোষগুলি, আর আসল গোড়াটি মাংসাদির দ্বারা আটক হয়ে যথাস্থানেই থেকে যায়। সবার উপরে আবার ঐ চুলের গোড়াতে একরকম রঞ্জক-কোষ আছে, সেগুলি চুলের সঙ্গে সঙ্গে প্রলম্বিত হতে থাকে, তারই দরুন কারো বা চুল কালো হয়, কারো বা কটা হয়।

তাহ'লে এমন সুরক্ষিত চুল কারো কারো বেলায় অনায়াসে খসে আসে কেন? কারো কারো মাথায় টাক পড়ে কেন? অকালে মাথার চুল পেকে সাদা হয়ে যায় কেন?

এ প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দেওয়া এখানে সম্ভব নয়, আর এ বিষয়ে অনেক কথা আমরা আজ পর্যন্ত জানিও না। কেবল মোটামুটিভাবে খানিকটা পর্যন্ত বলা যেতে পারে।

প্রথমত টাক পড়া, অর্থাৎ যাতে মাথার আশে পাশেই মাত্র চুল থাকে কিন্তু মাথার উপরকার চাঁদিটা কিংবা সামনের দিকের অংশটা একেবারে চুলবিহীন হয়ে চামড়া বেরিয়ে থাকে, এ জিনিসটা অনেক ক্ষেত্রেই একটা বংশগত বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ বাপের মাথায় টাক থাকলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলের মাথাতেও টাক হতে দেখা যাবে। এটি হয় স্বাভাবিক বংশগতির নিয়মে,—যার হবার তার হবেই, কোনোমতে নিবারণ করা যাবে না। ইংলণ্ডের রাজাদের মাথায় টাক বংশানুক্রমে চলে আসছে, কারো বেশী কারো কম। এর থেকেই বোঝা যাবে যে, এই বংশগত টাক হওয়া বন্ধ করার কোনো উপায় নেই।

কিন্তু এ ছাড়াও অনেকের মাথায় যা দেখা যায় তা ঠিক টাক নয়, অনেকটা টাকের "মতন"। অর্থাৎ চুলগুলি খুব ফাঁক ফাঁক হয়ে যায়, তার ভিতর থেকে মাথার চামড়া উঁকি মারতে থাকে। আবার এমন টাকও দেখা যায় যা চুলসমুদ্রের মধ্যে চুলবিহীন দ্বীপের মতো, যেন মাথার উপরকার খানিকটা সীমাবদ্ধ জায়গা থেকে চুলগুলিকে কেউ খাব্‌লে তুলে নিয়েছে। আবার এমনও দেখা যায় যেখানে ঠিক টাক হচ্ছে না, কিন্তু আঁচড়াতে গেলেই মাথার চুল হুশ্‌ হুশ্‌ ক'রে উঠে আসছে। মেয়েদের মাথায় এটা প্রায়ই দেখা যায় সন্তানাদি হবার পরে।

চুলে এইরূপ দোষ জন্মায় নানা রকমের জীবাণু ও সূক্ষ্ম জীবগোষ্ঠীর দ্বারা। তারাই চুলের গোড়া খেয়ে দেয় এবং আল্‌গা ক'রে দেয়। মাথায় যে প্রায়ই খুস্‌কি হতে দেখা যায়, তাও হয়ে থাকে এদেরই দ্বারা। এখানে চুলের নিজস্ব দোষ কিছু থাকে না। গাছের গোড়া যদি পোকায় খেয়ে ঝাঁঝরা করে দিতে থাকে, তাতে গাছের কি দোষ? এও ঠিক তেমনি ব্যাপার।

কিন্তু ঐ সব জীবাণু বা জীবগোষ্ঠী মাথার চুলে আসে কেমন করে?

ওরা আসে চিরুণীর সাহায্যে বা ধূলাবালির সঙ্গে উড়ে, বা অন্য ব্যক্তির সঙ্গে সংস্পর্শের দ্বারা, বা আরো অনেক উপায় আছে। ওগুলিকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য Gammexane, Ascabiol প্রভৃতি অনেক রকম ওষুধ আজকাল আবিষ্কৃত হয়েছে. চর্মরোগের বিশেষজ্ঞদের কাছে গেলেই তাঁরা বাৎলে দিতে পারবেন কার পক্ষে কোন্ ওষুধটি উপযোগী হবে। কিন্তু প্রধান কথা তা নয়, প্রধান কথা হলো যাতে ঐরূপ আক্রমণ নিবারিত হতে পারে তারই উপায় করা। কারণ রীতিমত ক্ষতি ক'রে ফেলার পরে তাদের ধ্বংস ক'রে ফেললেও সে ক্ষতির পূরণ হতে বিস্তর সময় লাগে, অনেক সময় ঠিক আগেকার মতো অবস্থা ফিরে আর আসে না।

চুলকে ঐ সকল বিপত্তি হতে বাঁচিয়ে রাখার উপায় কি? প্রথম ও প্রধান উপায়—চিরুণী সম্পর্কে সতর্ক হওয়া। নিজের চিরুণী ছাড়া অন্য কারো চিরুণী হাত দিয়ে ছোঁব না পর্যন্ত, ব্যবহার তো দূরের কথা, সে চিরুণী স্ত্রীরই হোক কিংবা স্বামীরই হোক—এই হবে 'মটো'। চিরুণীও না, কিংবা বুরুশও না। নিজের মাথার চিরুণী বুরুশ একেবারে আলাদা জায়গাতে তুলে রাখা থাকবে, অন্যের ব্যবহার্য জিনিসের থেকে তফাতে, আর অন্য কাউকে তা ব্যবহার করতে কখনই দেবে না। এতটাই সতর্ক থাকা চাই।

দ্বিতীয় কথা চুলের পরিচর্যা সম্বন্ধে। চুলের পরিচর্যা মানে চুলের গোড়ার কিছু যত্ন নেওয়া। গাছপালার শখ করতে গেলে গাছের গোড়াও মাঝে মাঝে খুঁচিয়ে দিতে হয়, সেখানে সার প্রয়োগ করতে হয়। চুলের গোড়া সম্বন্ধেও সেই কথা। চুলের মধ্যে আঙুলের ডগা চালিয়ে দিয়ে গোড়ায় গোড়ায় একটু খুঁচিয়ে দিতে হয় অর্থাৎ 'মাসাজ' করতে হয়।—কেবল খানিকটা তেল নিয়ে স্নানের আগে তাড়াতাড়ি চুলের উপর থাবড়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। তেল হলো চুলের পক্ষে

সারের মতো, চুলের গোড়ায় রীতিমত ঘষতে থাকলে তবেই সে সার ঠিক মতো প্রয়োগ করা হবে। এখানে তেলটাই গৌণ, ঘষাটাই মুখ্য। কোন্ তেল ব্যবহার করবো তা কোনো প্রশ্নই নয়। তবু যদি বিশেষ করে সেই প্রশ্নই করা হয়, তবে বলতে হয় যে, নির্ভেজাল নারিকেল তেলই চুলের পক্ষে সবচেয়ে ভালো সার, কারণ ওর মধ্যে চুলের উপযোগী খাদ্যবস্তু কিছু আছে। ক্যাস্টর অয়েলও চুলের পক্ষে মন্দ খাদ্য নয়। তা ছাড়া বাজারে যে সব প্যারাফিন মেশানো হরেক রকম সুগন্ধি তেল পাওয়া যায়, তার লেবেলগুলি যতই চটকদার হোক এবং অর্থমূল্য যতই বেশী হোক, খাদ্যমূল্য বিশেষ কিছু নেই। তার চেয়ে বেনের দোকানে লালজড়ি ও অন্যান্য জড়িবুটি মিশ্রিত যে সব তেলের মসলা পাওয়া যায়, তাই যদি নারিকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া যায়, তাতে অনেক বেশী কাজ পাওয়া যায়। একটা ওষুধ আছে, তার নাম Resorcin. কিছু পরিমাণে তাই যদি নারিকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া যায়, তাতে খুস্কি হওয়া ও মাথার চুল ওঠা নিবারিত হয়, এটা অনেকের বেলা দেখা গেছে। কিন্তু আসল কথা ঐ 'মাসাজ', অর্থাৎ ঘর্ষণ। রবীন্দ্রনাথের মাথায় সুন্দর চুলগুলির কথা সকলেই জানেন। তিনি কিন্তু অত চুল নিয়ে মাথায় কোনো কালেই কোনো তেল মাখতেন না। মাখতেন শুধু সরিষাবাটা। আমরা রান্নায় যেমন সরিষাবাটা ব্যবহার করি তেমন নয়, ভালো বাছাই করা সরিষা আধ-বাঁটা ক'রে দেওয়া হতো, সেই জিনিসটা নিয়ে তিনি মাথায় খানিকক্ষণ ঘষতেন এবং তার পর স্নান করতেন। তাতেই চুলগুলি অমন রেশমের মতো উজ্জ্বল ও মোলায়েম থাকত। আর মাঝে মাঝে তিনি তরল সাবান দিয়ে চুলের শ্যাম্পু করতেন। এটা করা বিশেষ দরকার, যারা লম্বা চুল রাখে তাদের পক্ষে ও মেয়েদের পক্ষে। আগেকার কালে মেয়েরা মাথাঘষা ব্যবহার করত। এখনকার কালে তার বদলে শ্যাম্পু করা

দরকার। সমান পরিমাণ সাবানের পাতলা ছাল ও নারিকেল তেল একত্রে মিশিয়ে একটু গরম করে নিলেই চমৎকার চুলের শ্যাম্পু হতে পারে। তাই দিয়ে উত্তমরূপে মাথায় ঘষে তার পর ধুয়ে ফেলা,—একবারে পরিষ্কার না হলে দুই দফা শ্যাম্পু করা, এই হলো বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা। এতে মাথার চুলে যা কিছু ময়লা বা দূষিত জিনিস থাকে সব ধুয়ে সাফ হয়ে যায়, কোনো কিছুই জড়িয়ে থাকতে পারে না।

উপযুক্ত যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও অনেকের চুল পাতলা ও নিস্তেজের মতো হয়। তা হতে পারে চুলের পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে। চুলেরও খাদ্য প্রয়োজন। গন্ধক ওর একরকম খাদ্য। যে খাদ্যে গন্ধক আছে সেগুলি চুলের পুষ্টির পক্ষে উপকারী—যেমন মূলা, বীন, পেঁয়াজ, রসুন, ডিম ইত্যাদি। ভিটামিনও দরকার হয় চুলের জন্য। চুলের পক্ষে সবচেয়ে উপকারী ভিটামিন হলো প্যাণ্টোথিনিক অ্যাসিড, যা বি-ভিটামিনের মধ্যে থাকে। আজকাল Calcium Pantothenate-এর বড়ি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, ওর ইন্‌জেকশনও আছে। এগুলি চুলের বাড়ার পক্ষে খুব উপকারী।

চুল পাকা অর্থাৎ সাদা হয়ে যাওয়া জিনিসটাও পছন্দ হবার মতো নয়, বিশেষত যদি তা অকালপক্কতা হয়। সাধারণত চল্লিশ বছরের নীচে চুল পাকা উচিত নয়। কিন্তু কারো কারো কুড়ি-পঁচিশ বছর বয়স থেকেই চুল পাকতে শুরু করে। মাথার সব চুল পাকে না, এক এক জায়গায় এক এক গুচ্ছ চুল পেকে সাদা হতে থাকে, বাকী সব জায়গার চুল কালোই থাকে। চুল পাকার কারণ এই যে, চুলের ভিতরকার কোষের মধ্যে বাতাস ঢুকে যায়, চুলের কালো রঙ সেই বাতাসের বুদ্‌বুদ ভেদ করে উপরে যেতে পারে না, তাই চুল তখন দেখতে সাদা হয়। কথিত আছে যে, মনে যাদের অত্যন্ত বেশী

দুশ্চিন্তা ঢোকে, তাদেরই চুল শীঘ্র শীঘ্র পাকে। দারুণ দুশ্চিন্তায় এক রাত্রেই মাথার চুল পেকে সাদা হয়ে যাবার কথা শোনা গেছে, যদিও একথা বাস্তবে কতদূর সত্য তা বলা যায় না। যাই হোক, চুল পেকে গেলে তাকে কলপ দিয়ে কালো করতে যাওয়া অত্যন্ত হানিকর, ওর মধ্যে যে para-phenylenediamine প্রভৃতি পদার্থ থাকে তা আমাদের চামড়ার পক্ষে ক্ষতিকারক। কলপ ব্যবহার করার বদলে যাতে চুল আর না পাকতে পারে তেমনি ব্যবস্থার দিকে মন দেওয়া উচিত। পূর্বোক্ত প্যাণ্টোথিনিক এসিড নামক ভিটামিন চুল পাকাও নিবারণ করতে পারে। লৌহ, আর্সেনিক প্রভৃতি জিনিস ঔষধরূপে ব্যবহার করলে তাতেও চুল পাকা নিবারিত হয়। তবে চুল পাকার ব্যাপারে বংশের প্রভাবই অনেকখানি কাজ করে। যাদের বংশে সকলেরই চুল চল্লিশ থেকে সাদা হয়ে গেছে, তাদের বংশধরদের বেলাতেও তাই হবে। আবার এমনও দেখা যায় যে, ৭০ বা ৮০ বছর বয়সেও বেশীর ভাগ চুলই কাঁচা আছে। তাও হয় বংশগতির ফলে।

ঠাণ্ডা ও গরম

কেউ কেউ বলেন যে, সারা বছরের মধ্যে শীতের সময়টাই সব চেয়ে ভালো। আবার কারো কারো দৃঢ় মত এই যে, গরমের সময়টাই ভালো। এই নিয়ে বহু তর্কাতর্কিও হয়ে থাকে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এ প্রশ্নের কোনো সুমীমাংসা হয়নি। এর কারণ যার যেমন ব্যক্তিগত রুচি ও অভিজ্ঞতা, কোন যুক্তি বা তর্কের দ্বারা তাকে খণ্ডন করা যায় না। ব্যক্তিগত কারণেই কেউ পছন্দ করেন শীত, কেউ পছন্দ করেন গ্রীষ্ম, যার যেমন ধাত। সেই ধাত অনুসারেই কেউ শীতে বেশি আনন্দ পান, কেউ গ্রীষ্মে আনন্দ পান। আবার এমন লোকও আছেন, যাঁরা বেশি শীতও পছন্দ করেন না, বেশি গরমও পছন্দ করেন না। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়াই তাঁদের পছন্দ। অপিচ এমন ব্যক্তিও আছেন যাঁরা শীতের সময় শীতকেই প্রচুর সমাদর করেন, আর গরমের সময় গ্রীষ্মকে। আমি একজনকে জানি, তিনি রীতিমত একজন শিক্ষিত ও মার্জিত ভদ্রলোক। তিনি পৌষ মাঘ মাসে গায়ে দিতেন সুতির পাঞ্জাবি, আর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের দুপুর রৌদ্রে মাঝে মাঝে হঠাৎ গরম কোট গায়ে চড়াতেন। বলতেন যে, এতেই তিনি আনন্দ পান, শীতে একটু কাঁপতে আর গরমের সময় ঘামতে তাঁর লাগে ভালো। এইজন্যই তো কথায় বলে 'ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ।' কত মানুষের যে কত রকম রুচি আছে তা লক্ষ্য করলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

কিন্তু আমরা বিজ্ঞানের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, সব কিছুকে সার্বজনীন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করি। সেই অনুসারে বলতে বাধ্য হবো যে, শীতের দেশের লোকেরা প্রচণ্ড শীতের সময়ের চেয়ে অপেক্ষাকৃত গরমের সময়টাকেই বেশি পছন্দ করে, আর গরমের দেশের

লোকেরা প্রচণ্ড গরমের চেয়ে ক্ষণস্থায়ী শীতের সময়টাকেই বেশি পছন্দ করে। অর্থাৎ শীতের দেশে শীতটা বড়ো বেশি একঘেয়ে হয়ে যায়, গরমের দেশেও গরমটা বড়ো বেশি একঘেয়ে হয়ে যায়, সেই কারণেই বৈচিত্র্যের প্রতি পরস্পরের এমন উল্‌টো রকমের অনুরাগ। গরমের দেশে গ্রীষ্মকালকে পছন্দ করছে এমন লোকের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

তবে শরীর ও স্বাস্থ্যের দিক থেকে বলতে গেলে গরমের সময়টা খুব খারাপ নয়। এই সময়টাতে সূর্যালোকের মাত্রা আমরা কিছু বেশি করেই পেয়ে থাকি, সেই কারণেই আমাদের গরম লাগে কিছু বেশি। কিন্তু এই সূর্যালোকই যে আমাদের জীবনধারণের পক্ষে বিশেষ দরকার। প্রাণের সঙ্গে সূর্যালোকের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। সূর্যালোক ছাড়া আমরা বাঁচি না। প্রচুর সূর্যালোক পেলে গাছপালারাও যেমন তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে, জীবজন্তু এবং মানুষরাও তেমনি তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা বিশেষভাবে জানা গেছে যে, শিশুরা গ্রীষ্মকালে যতখানি বেড়ে ওঠে, শীতকালে তার চেয়ে অনেক কম। গ্রীষ্মকালেই তারা তাড়াতাড়ি খানিকটা লম্বা হয়ে উঠতে পারে, শীতকালে তেমন নয়। তা ছাড়া এও দেখা গেছে যে, গ্রীষ্মকালেই আমাদের চুল বেশি বাড়ে, নখ বেশি বাড়ে, শীতকালে তার চেয়ে কম। তা'ছাড়া শীতকালে শীতের দেশে সর্বাঙ্গে মোটা কাপড় জড়িয়ে ঘরের সার্শি দরজা বন্ধ ক'রে মানুষ যে ভাবে থাকতে বাধ্য হয় তাতে দেহে সূর্যালোক না লাগতে পারায় তাদের ক্ষতি হয়। তাদের দেশের শিশুরা প্রায়ই রিকেট্‌স্ রোগে ভোগে, হাড় তাদের শক্ত হতে পারে না সূর্যালোকের অভাবে। তাই ঘর ছেড়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে তাদের খানিকটা রোদ খেয়ে আসতে হয়। আমাদের দেশে ঐ ব্যাধি খুব কম, কারণ এই গরমের দেশেও শিশুদের আমরা রোদে শুইয়ে দিই। গরমে কষ্ট পেলেও তাদের গায়ে যে রোদ

লাগা দরকার এ আমরা সহজ বুদ্ধিতেই বুঝতে পারি। গরমের সময় আমরা নিজেরাও প্রায় নগ্নদেহে থাকি, তাতে গায়ে আমাদের বেশ রোদ লাগে। তাতে চামড়া ভালো থাকে, স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। ঘা, পাঁচড়া প্রভৃতি চর্মরোগ তাতে কম হয়। শুধু চর্মরোগ কেন, গরমের সময়ে সকল রকম রোগেরই কম প্রকোপ। অবশ্য এ সময়ে পেট-সংক্রান্ত যত কিছু রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, কিন্তু তা কেবল আমাদেরই দেশে, আর কোথাও নয়। তার কারণ এগুলি বেশির ভাগই জলবাহিত রোগ। এ দেশে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাবার সমস্যাটা, আর মশা-মাছির উপদ্রব নিবারণের সমস্যাটা এখনও মেটেনি। ঐ দুটি ভারতীয় সমস্যা যখন মিটে যাবে তখন গরমের সময় আমাদের দেশে প্রায় কোনো রোগই থাকবে না। অন্যান্য সভ্য ও স্বাধীন দেশে অন্তত তাই দেখা যাচ্ছে। আর এক কথা। গরমের সময় আমাদের দেশের মৃত্যুসংখ্যা কমে যায়, শীতের সময়েই বাড়ে।

তবে এ কথা ঠিক যে, গ্রীষ্মের সময় উত্তাপের মাত্রা যখন অতিরিক্ত রকমে বেড়ে যায় তখন তা আমাদের পক্ষে কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে। প্রখর রোদের তাপে আমরা হাঁস-ফাঁস করতে থাকি,কোথাও যেন একটু শান্তি পাই না। দেহে কেবল আলস্য আসে, চোখে ঘুম আসে, শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়, কোনো কাজ করতে মন যায় না, আর ক্ষুধা কমে গিয়ে জল-তেষ্টার মাত্রা বেড়ে যায়। মনে হয়, কেবলই জল খাই, আর যত জল খাই তত ঘামতে থাকি। তখন কেবল এই ব্যাপারই চলতে থাকে। গাত্র-চর্মের ক্রিয়াটাই সবচেয়ে বেশি বেড়ে যায়, ক্রমাগতই ঘাম হতে থাকে।

কিন্তু এমন কষ্ট আমরা শহরে বাস করেই বেশিমাত্রায় পেয়ে থাকি। যেখানে অনেক মানুষে গাদাগাদি হয়ে ভিড় ক'রে থাকে, যেখানে পিচঢালা রাস্তা থেকে গরম ভাপ্ উঠছে, তার উপর দিয়ে ট্রাম, বাস, মোটর তপ্ত ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলেছে, কাজের তাগিদে মানুষকে দুপুর

রোদে ছুটোছুটি করতে হচ্ছে, বন্ধ অফিসঘরে কিংবা কারখানার মেসিন-ঘরে থেকে কাজ করতে হচ্ছে, সেখানেই এমন কষ্টভোগ। গরমের সময়টা ওরূপ কর্মব্যস্ততার সময়ই নয়।

আমাদের দেশের গাছপালায় ঘেরা ছায়াশীতল পল্লীগ্রামে কিন্তু এতটা ছুটোছুটিও নেই, আর এতটা কষ্টও নেই। সেখানে এই দারুণ গ্রীষ্মকেও মনোরম ক'রে তোলবার নানারকম উপায় আছে। সেখানে বড়ো বড়ো গাছের তলা, ঝোপ-ঝাপে ঘেরা পুকুর ধার, নদীর তীর, আমবাগান, খড়ের চালের বাড়িতে দরমা-ঘেরা দাটির দাওয়া, সব জায়গাই বেশ ঠাণ্ডা। আজকাল অনেকেই হয়তো গরমের সময় এমন পল্লীগ্রামে গিয়ে থাকবার সুযোগ পায় না, কিন্তু ছেলেবেলায় আমরা গ্রীষ্মের ছুটি হলেই শহর ছেড়ে পল্লীগ্রামে চলে যেতাম। সেখানে বড়ো বড়ো পুকুরের জলে ডুবে স্নান করা ও সাঁতার কাটার কি আরাম! দু'ঘণ্টা অন্তত না কাটিযে জল থেকে কেউ উঠতামই না। বেশি গরম হলে দু'বেলাই তাই। দুপুরের কয়েকটা ঘণ্টাই একটু যা গরম, তখন ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে থাকতে হতো। কিন্তু বিকেল চারটে বাজতে না বাজতেই বাইরে বেরিয়ে দেখতাম, গাছতলায় গাছতলায় প্রবীণ ব্যক্তিরা পাটি বিছিয়ে বসে গেছে, দাবা কিংবা পাশা খেলছে কিংবা রামায়ণ পাঠ শুনছে,—আর হু হু ক'রে দিব্যি ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। তখন কোথায় গরম? পুকুরপাড়ের গাছতলায় পাড়ার ঠান্‌দিদি বসতেন এক গামলা বেলের পানা নিয়ে, আমাদের সকলকে ডেকে ডেকে খাওয়াতেন। তার পরেই শুরু হতো তাঁর আশ্চর্য আশ্চর্য রূপ-কথা বলা। আমরা তাঁকে ঘিরে বসে তন্ময় হয়ে তাই শুনতাম, সন্ধ্যার অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত। গ্রীষ্মকালটাই আমাদের কাছে সব চেয়ে বেশি লোভনীয় ছিল, মনে হতো কতদিনে গ্রীষ্মের ছুটি আসবে।

কিন্তু আজকালকার দিনে অতটা আরামের জীবন সম্ভব না হলেও

এখন শহরে থেকেও গরমকে সহনীয় ক'রে নেবার অনেক রকম উপায় আছে। যাঁদের সম্পদ আছে প্রচুর তাঁরা নিজেদের ঘরকে এয়ার-কণ্ডিশন্‌ড্‌ করে নিতে পারেন, দরজা-জানালায় খস্‌খসের পর্দা দিয়ে সর্বক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে পারেন, ইলেকট্রিক পাখা চালাতে পারেন, রেফ্রিজারেটর থেকে বরফ-ঠাণ্ডা জল বা আইসক্রীম খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা করতে পারেন। তাঁদের পক্ষে প্রচণ্ড গরমের সময়েও বিশেষ কিছু কষ্ট নেই। কিন্তু যাঁদের এ সব কিছু জুটবার উপায় নেই তাঁদের পক্ষেও আরামের অনেক উপায় আছে।

প্রথমত খাদ্যের কথা। গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার মাত্রা কমিয়ে দেওয়া উচিত। মাংসাদি ও গুরুপাক খাদ্য এ সময় বর্জন করাই উচিত, কারণ খাদ্যের দ্বারা দেহে অতিরিক্ত উত্তাপ সৃষ্টির তখন কোনো দরকারই নেই। হজমশক্তি তখন কিছু কমেই যায়, সুতরাং বেশি খেলে সেগুলো হজম হবে না। আর আলস্যের জন্য দেহের পরিশ্রমও তখন কিছু কম, তাই খাদ্যের প্রয়োজনও কম। বেশি খেলেই বেশি হাঁস-ফাঁস করতে হয়, কম খেলে গরমও কম বোধ হয়। নিমন্ত্রণাদি খাওয়া এ সময় বর্জন করাই উচিত। যারা এ সময় মাত্রা বুঝে খায় তাদের কষ্ট কমই হয়।

দ্বিতীয়ত পানীয়ের কথা। জল যতটা খুশি খাওয়া যেতে পারে, অবশ্য যার যেমন খাওয়া অভ্যাস সেই অনুসারে। তবে বরফ দেওয়া জল নিশ্চয়ই নয়, তাতে অনেক রকম অনিষ্ট হতে পারে। জলের গ্লাস বরফের মধ্যে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা করে নিয়ে সে জল অবশ্য খাওয়া চলে। এ সময় ঠাণ্ডা সরবৎ খেতে খুব বেশি ইচ্ছে হয় বটে, কিন্তু দোকানের তৈরি পান্‌খা-বরফের সরবৎ না খেয়ে নিজের ঘরে তৈরি করেই তা খাওয়া উচিত। অন্যান্য সরবতের মধ্যে সবচেয়ে ভালো হলো কাঁচা আমপোড়ার সরবৎ, এতে শরীর সত্যই একটু স্নিগ্ধ হয়। অনেকে এ

সময় পান্তাভাত ও আমানি খেয়ে থাকে, তাও বেশ ভালো ব্যবস্থা। আমানি মানে পান্তাভাত ভিজানো জল, অনেকটা বার্লি ওয়াটারের মতো কাজ করে। লেবু মুন দিয়ে খেতে ভালোই লাগে। অতিরিক্ত গরমের সময় মুন বেশি মাত্রায় খাওয়া খুব ভালো। ঘামের সঙ্গে শরীর থেকে অনেক মুন বেরিয়ে যায়, অনেকে বলেন, তাতেই বেশি তাত লাগে। মুন বেশি খেলে সহজে বেশি তাত লাগে না। অতিরিক্ত গরম দেশে সৈনিকদেরও বেশি করে মুন খেতে দেওয়া হয়। মদ্যপান এ সময়ে একেবারেই বন্ধ করা উচিত, কারণ মদ্যপায়ীর পক্ষে হীট্-স্ট্রোক্ (Sun stroke) হবার সম্ভাবনা খুব বেশি, আর তা হলে সে অবস্থা থেকে তাদের বাঁচানোও খুব কঠিন।

তার পর স্নানের কথা। গরমের সময় দিনে দুই-তিনবার স্নানেও কোনো ক্ষতি হয় না। অবগাহন স্নান তো আরোও ভালো, তাতে আরো বেশি আরাম হয়। আর এক কথা, গরমের সময় প্রত্যহ সাবান ব্যবহার করা ভালো, তাতে ঘর্মকূপগুলো পরিষ্কার থাকে, ঘামে ময়লাতে মিশে সেগুলো বুজে যেতে পারে না। অনেকে স্নানের পরেও ভিজে গামছা গায়ে জড়িয়ে রাখে। এতে কোনো ক্ষতি নেই, যদি গামছাটি তেলচিটে-লাগা নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত না হয়। স্নানের পরেই কিছুক্ষণ যেন আরো বেশি গরম বোধ হয়, আর ঘামের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাওয়াতে ঐ সময় প্রচুর ঘামও ঝরতে থাকে। তখন ভিজে গামছা জড়ানো থাকলে বেশ আরাম পাওয়া যায়। আল্‌গা ভাবে জড়ানো থাকায় গায়ের চামড়া ও গামছার অন্তরালবর্তী বাতাসটুকু এয়ার-কণ্ডিশন্‌ড্ হয়ে বেশ ঠাণ্ডাই থেকে যায়, তাতে গরমটা যেন টের পাওয়াই যায় না। দুপুরের সময় ভিজে গামছাটা কাঁধে বা গায়ে ফেলে রাখা তাই আমাদের দেশের রীতি। এ সময় গায়ে জামা-কাপড়গুলো যত কম চাপানো হয় ততই উত্তম। পাতলা কাপড়ের পাঞ্জাবি আর

হাফ্‌শার্ট ছাড়া কিছুই দরকার নেই, তাতে শ্লীলতার কিছু হানি হয় না। ছেলেদের স্কুলে যাবার পক্ষে হাফ্‌প্যাণ্ট ও হাফ্‌শার্ট—এই যথেষ্ট। বয়স্ক পুরুষদের পক্ষেও তা চলতে পারে।

গায়ের চামড়া হাজার পরিষ্কার রাখলেও কিন্তু অনেকের ঘামাচি হয়, কারো কারো সারা দেহ ঘামাচিতে ছেয়ে যায়। এর জন্য অনেকে অনেক রকমের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন, চন্দন মাখা, ট্যালকম পাউডার লাগানো, পার্মাঙ্গানেট জলে গা ধোওয়া ইত্যাদি। কিন্তু ঘামাচি সারাবার সবচেয়ে ভালো উপায় ভিটামিন সি খাওয়া, খুব বেশি মাত্রায়। খাদ্যের ভিতর দিয়েই শুধু নয়, ভিটামিন সি-র ট্যাবলেট বেশি মাত্রায় দু'তিন দিন মাত্র খেলেই সমস্ত ঘামাচি কোথায় মিলিয়ে যায়।

শেষকালে বাতাসের কথা। গরমের সময় গায়ে বাতাস লাগা খুবই দরকার, কেবল শ্বাস নেবার জন্য নয়, বহমান বাতাস গায়ে লাগাবারই জন্য। বাতাস লেগে গায়ের ঘাম আপনা থেকে উবে যায়, অর্থাৎ উদ্বায়িত হতে থাকে। এই উদ্বায়নের ক্রিয়াটি খুবই দরকার, তাতেই শরীর ঠাণ্ডা থাকে। গুমোটের সময় তা হতে পারে না, কারণ তখন বাতাস চলে না, তাই সেই সময়েই সবচেয়ে বেশি কষ্ট। তখন পাখার বাতাস ছাড়া উপায় নেই। হাতপাখা বা খসখসের পাখা জলে ভিজিয়ে নিয়ে বাতাস করলে তাতে বেশ আরাম হয়। হাতপাখা চালানো অভ্যাসের কাজ, অনেকের এতে এমন অভ্যাস হয়ে যায় যে, তারা রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও হাতপাখা নাড়তে থাকে। আর এক কথা, রাত্রে ঘরের মধ্যে না শুয়ে ফাঁকায় অর্থাৎ খোলা বারান্দায় বা উঠানে খাটিয়া পেতে শোয়াই খুব ভালো, যেমন পশ্চিম দেশের লোকেরা ক'রে থাকে। এটা নিতান্ত দেহাতি রীতি নয়, অতি সুসভ্য আমেরিকার লোকেরাও আজকাল ব্যাল্‌কনিতে শয্যা পেতে ফাঁকায় শোয়া অভ্যাস করছে।

বেশ ও বাস

আমাদের দেহকে বেশ-বাস দিয়ে আচ্ছাদন করা যদিও এখন সভ্যতারই নিদর্শন, কিন্তু এর প্রথম উদ্ভাবনা সম্ভবতঃ প্রয়োজনের তাগিদেই হয়েছিল। অন্যান্য জীবজন্তুদের গায়ের উপর যেমন ঘন রোমের বা কঠিন অধিত্বকের আচ্ছাদন থাকে, মানুষের তেমন নয়। আমাদের গায়ের চামড়া তেমন লোমশও নয়, তেমন কঠিনও নয়। সেই কারণেই শীতাতপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমাদের অতিরিক্ত কিছু বাহ্য আচ্ছাদনের দরকার হয়। কিন্তু সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে আমরা নিজেদের বেশ ও বাসকে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী বাড়িয়েছি, যতটা দরকার তার চেয়ে অনেক বেশী কাপড়-চোপড়ের আবরণ দিয়ে দেহকে জড়াই। অসভ্যজাতির মানুষেরা কিন্তু এখনকার যুগেও খুব কম কাপড়-চোপড় ব্যবহার করে, এমন কি দারুণ শীতেও। হিমালয় পর্বতের আদিম অধিবাসীদের সামান্য মাত্র দেহাবরণ দেখে আমাদের তাই আশ্চর্য লাগে। এভারেস্টের চূড়ায় যাঁরা অভিযান করেছিলেন তাঁরা বলেন যে, তাঁদের সঙ্গে যে সব শের্‌পা থাকত তারা বরফের উপর দিয়ে হাঁটতেও জুতা ব্যবহার করেনি, এমনকি জুতা দিলেও তারা তা গ্রহণ করেনি। আরো শোনা যায় যে, দক্ষিণ মেরুর অধিবাসীরা সেখানকার দুরন্ত শীতেও একটি কম্বল ব্যতীত দেহে আর কিছুই রাখে না এবং তাও সর্বাঙ্গে জড়ায় না, যেদিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে, সেইদিকের কাঁধে কম্বলটা ফেলে রাখে মাত্র।

আমরা কিন্তু কাপড়-জামা জড়াই সর্বাঙ্গে, হাতটি মুখটি মাত্র বাদ রেখে। বর্তমান সভ্যতার তাই নির্দেশ এবং সভ্যজগতে বাস করে তা মেনে চলতে আমরা বাধ্য। নইলে লোকে অসভ্য বলবে। কিন্তু তাই

বলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি ক'রে অতিরিক্ত রকমে সভ্য হওয়াও ঠিক কাজ নয়। অথচ অনেক সময় তাই আমরা ক'রে থাকি। এটি আমরা শিখেছি পাশ্চাত্যের অনুকরণে। তাদের শীতপ্রধান দেশে যতটা জড়ানো প্রয়োজন, আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ততটা নয়, এ কথা হয়তো আমরা তখনকার দিনে ভেবে দেখিনি। আমাদের দেশে জামা, পায়জামা প্রভৃতির চল ছিল না, ছিল কেবল বস্ত্র ও উত্তরীয়, বড়জোর বহু গ্রন্থি দেওয়া পিরান। রীতিমত জামা প্রভৃতি পরতে শিখলাম তাদেরই কাছ থেকে।

কিন্তু এখন যে চাল চলে আসছে তাকে সহসা বদলানো যায় না এবং তার প্রয়োজনও নেই। কেবল এইটি দেখা দরকার যে, দেহকে আবরণ করতে গিয়ে দেহের কোনো অপকার করা না হয়। ইংরেজদের মতো টাইট প্যাণ্ট, শার্ট ও টাই, বোতাম-আঁটা ভেস্ট ও কোট প্রভৃতি আমাদের কিছুমাত্র দরকার নেই, টাইট কোনো পোশাকেরই দরকার নেই। আমাদের দেশের বেশবাস সর্বদাই থাকবে আল্‌গা এবং ঢিলে। স্মার্ট দেখাবার মতো আঁটসাট কিংবা পুরু ধরনের পোশাক আমাদের চলবে না।

এখানে এসে পড়ছে দেহের পক্ষে বায়ুসেবনের প্রশ্ন। ফুস্‌ফুস দিয়ে আমরা যেমন বায়ুশ্বাস গ্রহণ করে থাকি, গায়ের চামড়া দিয়েও তেমনি আমরা নিত্য বায়ুসেবন ক'রে থাকি। এই বায়ুসেবনে ব্যাঘাত ঘটলে চামড়া সুস্থ থাকে না। যে সকল ইউরোপীয় সাহেবরা এদেশে এসে বাস করছে, তাদের অনাচ্ছাদিত দেহ একবারও যারা দেখেছে তারাই জানে যে মুখ ও হাতের থেকে ওদের বুক ও পিঠের রং কতখানি আলাদা। মুখের চামড়াতেও যথেষ্ট ঔজ্জ্বল্য থাকতেও ওদের বুকের পিঠের চামড়ায় একেবারেই কিছু ঔজ্জ্বল্য নেই, মরা। মোমের মতো সাদা ফ্যাক্‌ফ্যাক্ করছে। সেখানকার চামড়ার যেন প্রাণ নেই। মেয়েরা

যারা সর্বক্ষণ টাইট বডিস প্রভৃতি এঁটে থাকে তাদেরও সেই সব অংশের চামড়া অনেকটা ঐরকম বর্ণহীন ও নিষ্প্রভ দেখায়। তার কারণ সেখানে আদৌ বায়ু প্রবেশ করে না। তদ্ভিন্ন ঐ সকল অংশে রক্ত-চলনও যথারীতি ঘটতে পারে না। বেশ-বাসের উদ্দেশ্যই তাতে ব্যর্থ হয়, উপকারের বদলে অপকার হতে থাকে। বেশ-বাসের উদ্দেশ্য ঢাকা দেওয়া, কিন্তু ওতে হয় চেপে ধরা।

পরিধেয় এমন হওয়া চাই যাতে তার দ্বারা দেহের উপর কোনো চাপ লাগবে না, তার তলা দিয়ে দেহের সঙ্গে বায়ুর সংস্পর্শ ঘটতে পারবে, অথচ তা দেহকে বাইরের ধুলাময়লার থেকে আড়াল ক'রে পরিচ্ছন্ন রাখবে, আর গরমের সময় দেহকে তা শীতল করবে, ঠাণ্ডার সময় দেহকে তা গরম রাখবে। এই সকল দিকে লক্ষ্য রেখেই পরিধেয় নির্বাচন করা দরকার। এখানে বাহারের চেয়ে স্বাস্থ্য বজায় রাখার দিকেই বেশী ঝোঁক দেওয়া উচিত। আজকাল অনেকেই এদিকে বিশেষ নজর দিচ্ছেন, কিন্তু কতকগুলি চাকরিস্থলে—বিশেষত পুলিশ, সৈনিক, জাহাজের নাবিক প্রভৃতির চাকরিতে যেরূপ পোশাক পরতে বাধ্য হতে হয়, তাতে অনেক সময় অতিরিক্ত গুরুভার ও আঁট-সাঁট হওয়াতে তা কষ্টকর এবং অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ে। এর সংশোধন হওয়া উচিত।

জুতা ব্যবহার সম্বন্ধেও এ কথাগুলি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আমরা হয় পরি সরুমুখ আঁট জুতা, নয় পরি খোলামেলা স্যাণ্ডেল চটি। দুইই খারাপ। আঁট জুতায় পায়ের রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়, আঙুলে কড়া পড়ে এবং আঙুলের গঠন বিকৃত হয়। তদ্ভিন্ন আঙুলের খাঁজে খাঁজে হাজার ঘা হয়ে যেতে পারে, নখের কোণ চেপে গিয়ে নখকুনি রোগ হতে পারে। স্যাণ্ডেল চটিতে যদিও এই সব হয় না কিন্তু ওতে অন্যান্য রকমের বিপদ আছে। ওতে অসাবধানে চলতে গিয়ে পা মচ্‌কে

যেতে পারে, পায়ের তলায় কাঁকর ফুটে যেতে পারে, পোকামাকড় কামড় দিতে পারে। বাড়িতে চটি চলে, গাড়ীতেও চলে, কিন্তু পথে হাঁটতে গোড়ালি ঢাকা জুতাই দরকার। এবং তা ছুঁচলোমুখ না হয়ে যথেষ্ট চওড়ামুখ হওয়াই উচিত। কাবুলি ধরনের জুতা একপক্ষে খুবই ভালো, ওতে আঙুলগুলিতে আদৌ চাপ লাগে না এবং ইচ্ছামত ঢিলা করেও নেওয়া যায়: পথে বেশী হাঁটার পক্ষে চামড়ার চেয়ে সস্তা দরের 'নরম' ক্যাম্বিশের জুতা খুবই ভালো।

পোশাক হওয়া উচিত ঋতু অনুযায়ী, একথা আমরা সব সময় স্মরণ রাখি না। আমাদের ভুল হয় প্রথমত পোশাকের রং সম্বন্ধে, দ্বিতীয়ত কাপড়ের বুনানি সম্বন্ধে, তৃতীয়ত পরিধেয়ের উপাদান সম্বন্ধে। পোশাকের রং কখন কেমন হওয়া দরকার এটি সামান্য প্রশ্ন নয়। কাপড়ের সাদা কিংবা ফিকা রং বাইরের উত্তাপকে প্রতিরোধ করে, কালো কিংবা গাঢ় রং উত্তাপকে সংরক্ষণ করে। একই রকম কাপড়ের সাদা রংএ এবং কালো রংএ প্রায় ৪৭ ডিগ্রী উত্তাপের তফাৎ হয়ে যায়। তাই গ্রীষ্মকালে সর্বদা সাদা কিংবা ফিকা রংএর কাপড়ই ব্যবহার করা উচিত। শীতের সময় কোন গাঢ় রংএর কাপড় ব্যবহার-করা সমীচীন। শীতের সময়ের জামাকাপড় প্রত্যহ কাচার দরকার হয় না। কিন্তু গরমের সময় সেগুলি প্রত্যহই কাচা চাই, একথাও স্মরণ রাখা উচিত।

তারপর কাপড়ের বুনানির কথা। অত্যন্ত ঠাস বুনানির কাপড় আমাদের দেশের পক্ষে আদৌ উপযোগী নয়। বস্ত্রাদি এমন হাল্কা ও ছিদ্রযুক্ত হওয়া উচিত যার ভিতর দিয়ে কিছু বায়ু প্রবেশ করতে পারে। বেশী পুরু কাপড় হলে তা গায়ের ঘাম শুষতে পারে না, সেইজন্যই যথেষ্ট ছিদ্রযুক্ত গেঞ্জি ব্যবহার করবার সাধারণ রীতি। গরমের সময় তার উপর একটা পাতলা পাঞ্জাবি বা শার্ট পরলেই যথেষ্ট। আধুনিক

হাল্কা ধরনের হাওয়াই-শার্ট ও ভালো। ছোটো ছেলেদের পক্ষে হাফ প্যাণ্ট ও হাফ শার্ট চমৎকার পোশাক, এতে তারা অবাধে ছুটোছুটি করতে পারে। মেয়েদের পক্ষেও ছিদ্রযুক্ত পাতলা কাপড়ের বা গেঞ্জির কাপড়ের জামা ব্যবহার করা উচিত, অতিরিক্ত অাঁট জামা কখনই পরা উচিত নয়। শীতের সময়েও অত্যন্ত পুরু নিশ্ছিদ্র কাপড়ের জামা ব্যবহার করা ঠিক নয়, কারণ তার নীচে বায়ু প্রবেশ করতে পারে না। সেই হিসাবে ঠাসবুনানি পশমী কাপড়ের জামা অপেক্ষা হাতে বোনা পশমের জাম্পার বা সোয়েটার প্রভৃতি অনেক ভালো। তাতে বেশ গরমও হয়, কারণ ওর নীচেকার বায়ুটাই গরম হয়ে ওঠে।

কোন্ সময়ে কোন্ জাতীয় কাপড়ের জামা ব্যবহার করা উচিত?

সাধারণত চামড়ার উপর নরম তূলার কাপড় ছাড়া অন্য কোনো জিনিস ব্যবহার করা ঠিক নয়, কারণ তূলা ছাড়া অন্য কোনো জিনিস উত্তমরূপে ঘাম শুষে নিতে পারে না। এমন কি শীতের সময়েও প্রথমে তূলার গেঞ্জি বা তূলার জামা গায়ে দিয়ে তার উপর পশমের জামা প্রভৃতি চাপানো উচিত, নতুবা পশমের জিনিস গায়ের সংস্পর্শে থাকলে তাতে গা কুট্‌কুট্ করতে পারে। স্বাস্থ্যেরও তাতে ক্ষতি হয়। আমাদের দেশের পক্ষে তূলা থেকে প্রস্তুত কাপড়ই সকল সময়ের পক্ষে ভালো। খদ্দর কাপড়ের জামা শীতকালেও গা গরম রাখতে পারে। সে পক্ষে খদ্দরের চাদরও বেশ ভালো। অনেকে আবার শখ ক'রে রেশমের বা কৌষেয় বস্ত্রের জামা ব্যবহার করে থাকেন। দেখতে শৌখীন হলেও তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়, কারণ তা ঘাম শুষতে পারে না এবং তাপ সংরক্ষণ করতেও পারে না। পরিচ্ছদ বস্ত্রের শোষণগুণ থাকা চাই। এবং তা উত্তাপের পরিবাহী হওয়া চাই। এই সকল নানাদিক বিবেচনা করে আমাদের বেশ-বাস নির্বাচন করতে হবে।

বায়ুগ্রহণ ও বায়ুসেবন

বায়ুগ্রহণ আর বায়ুসেবন, এ দুটি হলো আলাদা জিনিস। বায়ুকে আমরা গ্রহণ করি নাক দিয়ে ফুস্‌ফুসের মধ্যে, আর বায়ুকে সেবন করি বাহিরের গাত্রের সর্বাঙ্গ দিয়ে। দুটোর কাজ আলাদা, আর, একটির প্রয়োজনীয়তা অন্যটির চেয়ে কম নয়। এই পার্থক্য বুঝতে হবে।

প্রথমে বলি বায়ুগ্রহণ বা শ্বাসগ্রহণের কথা। বায়ুর শ্বাস অবিরাম-ভাবে আমাদের নিত্যই গ্রহণ করতে হয় অক্সিজেনের জন্য। এই অক্সিজেন ব্যতীত আমাদের কয়েক মিনিটও বাঁচা সম্ভব নয়। অক্সিজেন চাই প্রতি তন্তুতে, প্রতি কোষে কোষে। শ্বাসগ্রহণের দ্বারা আমরা দেহের সকল অংশে এরই যোগান নিতে থাকি। কিন্তু এই অক্সিজেন পাবার জন্য একটুও আমাদের ভাবতে হয় না, কারণ পৃথিবীতে বায়ু সর্বত্রই ব্যাপ্ত হয়ে আছে, আর অক্সিজেনের পরিমাণও তার মধ্যে সর্বত্রই সমান। আমাদের পৃথিবীকে ঘিরে যে বায়ুমণ্ডল রয়েছে, তার মধ্যে অক্সিজেনের কোনো কমবেশী নেই। পৃথিবীর মাটি ছেড়ে যদি আমরা উপরদিকে উঠে যাই, যেমন এরোপ্লেনে আজকাল সকলেই উঠছে, কিম্বা কেউ কেউ পর্বত অভিযানে যাচ্ছে—তবে তের হাজার ফুট উঁচুতে পর্যন্ত উঠেও প্রায় সমানই অক্সিজেন পাওয়া যাবে। কিন্তু তারও বেশী উপরকার বায়ুতে অক্সিজেনের মাত্রা ক্রমশ কমে আসবে। ষোলো হাজার ফুটের বেশী উপরে উঠতে হলে অক্সিজেন সঙ্গে নেবার দরকার হবে, কারণ সেখানকার বায়ুর অক্সিজেন এতই কম যে তাতে আমাদের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে। হয়তো সেখানে অক্সিজেন সঙ্গে না থাকলে অজ্ঞান হয়ে পড়ব।

কিন্তু উপরের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক। আমরা সর্বক্ষণ রয়েছি

পৃথিবীর সমতল ভূমিতে। এখানকার বায়ুর অক্সিজেন সর্বত্রই সমান। বাহিরের বায়ুতেও যতটা অক্সিজেন, ঘরের ভিতরকার বায়ুতেও তাই। অতএব যখন যেখানেই থাকি, তাতে অক্সিজেনের ঘাটতি হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এ-পাড়ায় থেকেও আমরা যতটা অক্সিজেন পাবো, ও-পাড়াতে গিয়েও ততটাই পাবো। ঘরে বাইরে সমানই অক্সিজেন। তবে ঘরের বায়ুর চেয়ে বাইরের বায়ুকে আমরা পছন্দ করি কেন, বদ্ধ বায়ু থেকে বেরিয়ে মুক্ত বায়ুতে থাকতে চাই কেন? স্থির নিশ্চল বায়ুতে অক্সিজেন থাকলেও তাতে আমাদের কাজ চলে না। বায়ু বহমান হাওয়া চাই, তা শীতল ও নির্মল হওয়া চাই, এবং তা রোগ-বীজাণুমুক্ত হওয়া চাই। বাইরের মুক্তবায়ুতে এই সব গুণ আছে, ঘরের বায়ুতে প্রায়ই তা নেই। ঘরের বায়ুতে ঘরের ধুলা, ধোঁয়া, নানারকম দুর্গন্ধ ও বিষাক্ত গ্যাস, এবং রোগবীজাণুও প্রায়ই থাকে। মুক্ত বায়ুতে এগুলি নেই। এই কারণে ঘরের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা থাকলে আমরা যেন অস্থির হয়ে উঠি; মাঝে মাঝে ঘর থেকে বাইরে বেরোতেই হয়।

ঘরের বায়ুকেও অবশ্য অনেকটাই গ্রহণযোগ্য ক'রে নেওয়া যায়। রুজু রুজু অনেকগুলো দরজা-জানালা থাকলে বাইরের মুক্ত বায়ু তার ভিতর দিয়ে অল্পবিস্তর পরিমাণে বাতায়িত হতে পারে। তা ছাড়া আজকাল শহরে এবং অনেক গ্রামেও ইলেকট্রিক পাখার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু তবু বাইরের বাতাস যেমন, ঘরের বাতাস ঠিক তেমনটি হয় না। পার্থক্য কিছু থেকেই যায়।

বাইরের মুক্ত বায়ুই আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে সবচেয়ে উপকারী। যারা বেশীর ভাগ সময় মুক্ত বায়ুতে থাকে, তাদের রোগ হবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। চাষীদের মধ্যে, সাঁওতালদের মধ্যে, সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে সর্দি-কাশি, হাঁপানি, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ খুব কমই দেখা যায়। ফাঁকা পল্লীগ্রামে যত দীর্ঘায়ু মানুষ দেখা যাবে, শহরের ভিড়ে তত বেশী

দেখা যাবে না। যারা শহরের মানুষ, বেশীর ভাগ সময় ঘরের মধ্যে কাটাতে হয়, অফিস, আদালত বা কারখানায় যাদের সারা দিন কাটে, তারাই মুক্তবায়ুকে ভয় করে। ঘরে ফিরে তারাই দরজা জানালা এঁটে বন্ধ করে, আর তারাই ঐ সব রোগে প্রায়ই ভোগে। একটুতেই তাদের শ্বাস-যন্ত্রের কল বিগড়ে যায়। এর কারণ অক্সিজেনের অভাব নয়, মুক্ত বায়ুরই অভাব। মুক্ত বায়ুতে থাকার অভ্যাসের অভাব। তারা আরো যত বেশী সাবধান হতে চেষ্টা করে, অর্থাৎ মুক্ত বায়ুকে বর্জন ক'রে থাকতে চেষ্টা করে, ততই আরো বেশী রোগপ্রবণতা বাড়ে। মুক্ত বায়ুকে এড়িয়ে চলা নয়, মুক্ত বায়ুকে সহজে গ্রহণ করা এবং তাতে অভ্যস্ত হওয়াই সকলের পক্ষে দরকার।

অবশ্য সভ্য মানুষদের পক্ষে সব সময় মুক্তবায়ুতে থাকা সম্ভব নয়। বিশেষত শহরের মানুষদের পক্ষে এবং গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের তা একেবারেই সম্ভব নয়। অধিকাংশ সময়ই তাদের সীমাবদ্ধ স্থানে আবদ্ধ বায়ুর মধ্যে থাকতে বাধ্য হতে হয়। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, যদি মাঝে মাঝে এক আধবার মুক্তবায়ু গ্রহণের সুযোগ করে নেওয়া যায়। জলের প্রাণীরা সর্বক্ষণ জলের মধ্যেই থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে তারা জলের উপর ভেসে উঠে কিছু মুক্তবায়ু নেয়; আমাদের পক্ষে এও হবে অনেকটা সেই ধরনের ব্যাপার। ইচ্ছা করলে আমরা হাজার কাজের মধ্যেও মুক্তবায়ু গ্রহণের সুযোগ নানাভাবেই ক'রে নিতে পারি। সকালে উঠে বাজার করতে যাওয়া, বিকালে খেলার মাঠে খেলা দেখতে বা খেলতে যাওয়া, সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ ছাদের উপর কিম্বা খোলা বারান্দায় বসা, রবিবার বা ছুটির দিনে বাইরে কোথাও খোলা জায়গায় পিকনিক করতে যাওয়া, বছরের মধ্যে কিছুদিন ছুটি নিয়ে পল্লীগ্রাম অঞ্চলে কোথাও বাস করে আসা, ইত্যাদি যার যেমন সুবিধা, সে তেমনি কিছু একটা ক'রে নিতে পারে। তাতেই যথেষ্ট

কাজ হবে, কারণ তাতে সব সময়ে সকল ঋতুর মুক্তবায়ু গ্রহণের অভ্যাসটা বজায় থাকবে। তাতে গ্রীষ্মের গরম বাতাস এবং বর্ষার ভিজে বাতাস যেমন সহ্য হবে, তেমনি শীতের ঠাণ্ডা বাতাসও সহ্য হবে। একটু ঠাণ্ডা লাগলেই অমনি হাঁচি-কাশি শুরু হবে না। আর অধিকাংশ সময়ের আবদ্ধ ও দূষিত বায়ু গ্রহণের যা কিছু গ্লানি তা ঐ সাময়িক মুক্ত বায়ু গ্রহণের ফলে সমস্ত দূর হয়ে যাবে।

মুক্ত বায়ু গ্রহণের সবচেয়ে ভালো রকম ব্যবস্থা করা যেতে পারে রাত্রিকালে নিদ্রার সময়। যাদের পক্ষে তেমন সুযোগ আছে, তারা ঘরের মধ্যে না শুয়ে বাইরে শোয়া অভ্যাস করতে পারে। পশ্চিম দেশে গরমের সময় অনেকেই তা করে থাকে এবং পল্লীগ্রামেও অনেকের পক্ষে তা করা সম্ভব, যদি ভয়ের কারণ না থাকে। মশা নিবারণের জন্য মশারি খাটিয়ে নিলেই চলতে পারে। যাদের শ্বাসযন্ত্র দুর্বল আর যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ হবার সম্ভাবনা, তাদের পক্ষে এটা বিশেষ দরকার। শুধু তাই নয়, যাদের নার্ভের নানারকম দোষ আছে—যাকে চলিত কথায় আজকাল বলে স্নায়ুদৌর্বল্য বা নিউর‍্যাসথিনিয়া বা নার্ভাসনেস ইত্যাদি —তাদের পক্ষেও এটি বিশেষ উপকারী। ঘুমের সময় আমরা জাগার অপেক্ষা একটু গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করে থাকি। সেই সময় যদি নির্মল ও শীতল মুক্তবায়ু আমাদের ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে, তাহলে সমস্ত শরীরকে তা এমনভাবে তাজা করে দেয় যে অনেক অসুস্থতা ও দুর্বলতা তাতে আপনিই ঘুচে যায়। যক্ষ্মা রোগের হাসপাতাল বা স্যানাটোরিয়ম মাত্রেই রোগীদের বাইরের মুক্ত বায়ুতে শুইয়ে রাখার ব্যবস্থা আছে, তাতেই অর্ধেক রোগ তাদের সেরে যায়। অনেক হাঁপানি রোগীকেও মুক্ত বায়ুতে শোয়া অভ্যাস করিয়ে আরোগ্য হতে দেখা গেছে। অনিদ্রা এবং মস্তিষ্কের উত্তেজনাও এতে আরোগ্য হতে দেখা গেছে।

কলকাতা শহরেও মুক্তবায়ুতে শোয়ার ব্যবস্থা করা যায়। নিইইয়র্কের মতো বিরাট শহরেও ২০।৩০ তলা উঁচু স্কাইস্ক্রেপার বাড়িগুলোর প্রত্যেক জানলায় রাত্রিকালে একরকম ব্যালকনি (balcony) বের ক'রে দেওয়া হয়, তার উপর থাকে একটু তাঁবুর মতো আচ্ছাদন, সেখানে হাল্কা ধরনের খাট পেতে অনেকে নিদ্রা যায়, এমন কি দারুণ শীতকালেও। আমাদের গরীব দেশে তা সম্ভব না হলেও আমাদের বাড়ির উপর খোলা ছাদ আছে,সেখানে একটা হোগলার চালা বেঁধে তার নীচে শোয়া যায়। কিংবা ঘরের সামনের বারান্দায় খাটিয়া পেতেও শোয়া যায়। শহর হলেও সেখানকার উপরতলার বায়ু যথেষ্ট নির্মল, কারণ রাত্রিকালে রাস্তায় গাড়িও চলে না, লোকও চলে না, তখনকার সময়ে ছাদের কিংবা বারান্দার বায়ুকে মুক্ত বায়ুই বলতে হবে।

কিন্তু অনেকের পক্ষে এটাও সম্ভব নয়। ঘরের মধ্যে ছাড়া রাত্রে অন্য কোথাও শোবার সুযোগই নেই। তাদের পক্ষে আরো একটি চমৎকার উপায় আছে, কিছুক্ষণ মুক্ত বায়ুতে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে শ্বাস-গ্রহণের ব্যায়াম করা, যাকে বলে deep breathing। সাধারণত আমরা অজ্ঞাতসারেই শ্বাসগ্রহণ করি, কিন্তু এটা হবে জ্ঞাতসারে, নিজের চেতন ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, যখনই ফুরসৎ পাওয়া যাবে তখনই মুক্ত বায়ুতে গিয়ে কয়েকবার গভীরভাবে এবং ধীরে ধীরে শ্বাস টেনে নেওয়া, যতখানি পর্যন্ত নিতে পারা যায়। তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে তেমনি ধীরে ধীরে নিশ্বাস ত্যাগ করা, যতখানি পর্যন্ত পারা যায়। মুখ বুজে দুই নাক দিয়েও তা করা যায়, অথবা পর্যায়ক্রমে এক নাক দিয়ে টানা এবং অন্য নাক দিয়ে ফেলা আরো ভালো, যেমনভাবে আমাদের দেশে প্রাণায়াম করে। এও এক রকমের ব্যায়াম, বুকের ও পেটের মাংসপেশীগুলি এতে বিলক্ষণ ক্রিয়া করে। কিন্তু এটি ঠিক জোর করার কাজ নয়, নিঃশব্দে এবং ধীর

গতিতে শ্বাস নিতে হবে এবং ছাড়তে হবে, যেন একটুও সোঁ সোঁ আওয়াজ না বেরোয়। এমনি গভীর-ভাবে শ্বাস টেনে নেওয়া এবং ফেলা প্রথমে মিনিটে তিনবার, তারপর মিনিটে প্রায় তুইবারে দাঁড়িয়ে যাবে। এমনিভাবে এককালীন দশ মিনিট বা পাঁচ মিনিট করলেই যথেষ্ট। দৈনিক অন্তত পাঁচ ছয় দফায় এটি করা চাই, যখন সুযোগ মিলবে। নিয়মিতভাবে করতে পারলে এর ফল অতি আশ্চর্য, তুই তিন মাসের মধ্যেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। এতে শ্বাস গ্রহণের ক্ষমতা তাড়াতাড়ি অনেকখানি বেড়ে যায়, এবং ফুসফুসের ভিতরটা বায়ুধোলাই হয়ে বাষ্পীয় ক্লেদবস্তু অনেকখানি মাত্রায় বের করে দেওয়া যায়। মনে তুঃখ হলে আমরা স্বভাবতই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি, ভারাক্রান্ত মনকে হাল্‌কা ক'রে ফেলতে ; এতেও দেহের পক্ষে সেই ধরনের কাজ হয়। কোথা থেকে কেমনভাবে হয়, তা সঠিক বলা যায় না, কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে পাঁচ মিনিট এইভাবে গভীর শ্বসন-ক্রিয়া করলেই সমস্ত অবসাদ, ক্লান্তি ও গ্লানি দূর হয়ে গিয়ে দেহে যেন একটা নতুন স্ফূর্তি এসে যায়। সেটা অক্সিজেনের দরুন নিশ্চয়ই নয়, সম্ভবত ফুসফুসের ভিতরটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া এবং রক্ত চলাচল বেড়ে যাওয়ার দরুন। তা ছাড়া নিয়মিত অভ্যাসে স্থায়িভাবের উপকারও এতে অনেক রকম পাওয়া যায়। এতে ছাতির প্রসারতা বেড়ে গিয়ে যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অনেকটা কমে যায়। আর এতে রোগা মানুষদের দেহের ওজন বাড়ায়। এতে রক্তের চাপ (blood presure) কমিয়ে দেয়। আরো বিশেষ কথা, এতে মানসিক শক্তির উৎকর্ষ ঘটায়। ইউরোপের প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও চিন্তক ক্যাণ্ট (Kant) প্রত্যহ এটি অভ্যাস করতেন, তিনি বলতেন যে এতে তাঁর মস্তিষ্ক সাফ হয়ে যায়। শ্রীঅরবিন্দও প্রাণায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে এই কথাই বলেছেন।

কিন্তু এসকল কথা হলো বায়ুগ্রহণ সম্বন্ধে। বায়ু সেবনের কথা এর থেকে স্বতন্ত্র। বায়ুসেবন আমরা নাক দিয়ে নয়, বাহিরের সর্ব অঙ্গ দিয়েই করে থাকি। এও আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ আমরা উষ্ণরক্তবিশিষ্ট (warm-blooded) প্রাণী। আমাদের দেহের মধ্যে এবং দেহের রক্তের মধ্যে নিত্যই উত্তাপের সৃষ্টি হচ্ছে। নিত্যই সেই উত্তাপের অল্পবিস্তর অংশ বাইরে বের করে দিয়ে বাইরের উত্তাপের সঙ্গে দেহের উত্তাপের একটা সঙ্গতি রক্ষা হতে থাকা দরকার, নইলে বাঁচতে পারব না। এই কাজটি অনবরতই হতে থাকে আমাদের গাত্র-চর্মের দ্বারা এবং তা বায়ুরই নিত্য সংস্পর্শে। গা আমাদের কাপড় দিয়ে ঢাকাই থাক কিংবা খোলাই থাক, বায়ুর সংস্পর্শ হবেই। গ্রীষ্মের সময় ভিতরে যেমনি গরম হচ্ছে, অমনি গা দিয়ে ঘাম বেরোচ্ছে, বাতাসে তা উদ্বায়িত হয়ে দেহকে শীতল করে দিচ্ছে। শীতের সময় যখন ভিতরের গরম কম হচ্ছে, তখন গরম কাপড়চোপড়ের ভিতরকার বায়ু গরম হয়ে দেহকে গরম করে দিচ্ছে। এমনিভাবে দেহের তাপের একটা আদান-প্রদানের সামঞ্জস্য নিত্যই থাকা চাই। গায়ে বায়ু লাগার দ্বারাই সেই কাজটি হতে থাকে। হঠাৎ যদি এ কাজ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলেই মৃত্যু, নাক দিয়ে অক্সিজেন ঢুকতে থাকলেও বাঁচব না। "অন্ধকূপ হত্যার" ব্যাপারটা এমনি করেই হয়। বহু লোককে যদি একটা ছোটো ঘরের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে ভরে দেওয়া হয়, তাহলে তাদের মধ্যে অনেকেই যে মারা যায় তা অক্সিজেনের অভাবে নয়, দেহের এই তাপ আদান-প্রদানের অভাবে। কুম্ভ মেলায় আকাশের নীচে উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়িয়েও যে অনেক মানুষ ভিড়ের চাপে মারা পড়ল, তার মধ্যে কতক বাস্তবিক চাপা পড়েই মরেছে বটে, কিন্তু অধিকাংশই মরেছে হাঁপিয়ে উঠে—অর্থাৎ চারিদিকের মানুষের ঠাসাঠাসিতে দেহ-যন্ত্রের এই তাপ নিষ্কাশনের কল হঠাৎ বিগড়ে গিয়ে। গাত্রচর্মের সঙ্গে

বায়ুর কিছুমাত্র সংস্পর্শ বজায় থাকলে এ কল বিগড়োয় না। গাত্র-চর্মের চারিপাশে এতটুকু ফাঁক থাকা চাই, যাতে সেখানে বায়ুর সঙ্গে নিত্য তাপের আদান-প্রদান হতে পারে। এটি সর্বক্ষণই হওয়া চাই।

অতএব বায়ু সেবনের প্রয়োজনীয়তা কোথায় তা এখন বেশ বোঝা গেল। এই কারণেই আমরা ভিড়ের মধ্যে বেশীক্ষণ টিঁকতে পারি না, ফাঁকায় বেরিয়ে আসতে চাই। কিন্তু শহরের মধ্যে সর্বত্রই তো ভিড়, ফাঁকায় থাকবার সুযোগ কোথায়? আবার লোকসমাজে নগ্ন দেহেও থাকা যায় না। কাজেই মাঝে মাঝে দেহকে যতটা সম্ভব নগ্ন ক'রে "বায়ু-স্নান" করিয়ে নেওয়া দরকার হয়, পুরুষদের পক্ষেও এবং মেয়েদের পক্ষেও। দেহচর্মের অনেকটা অংশ যদি মুক্ত বায়ুর সংস্পর্শে কিছুক্ষণ থাকে, তাতেই বাকী অংশটুকুর কাজ হয়ে যায়। পুরুষেরা খালি গায়ে প্রত্যহ কিছুক্ষণ অনায়াসেই থাকতে পারে। মেয়েরাও একলা ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ খালি গায়ে থাকার সুযোগ ক'রে নিতে পারে। আর রাত্রে জামা ছেড়ে খালি গায়ে শোয়াই সবচেয়ে ভালো। যতক্ষণ খালি গায়ে থাকা যায় ততক্ষণই ভালো।

অতএব নাক দিয়ে বাতাস নেওয়া আলাদা কথা, আর গায়ে বাতাস লাগানো আলাদা কথা। গায়েই আমরা পাখার বাতাস খেয়ে থাকি, নাকে নয়। তাতে গায়েই আমরা আরাম পাই। একেই বলছি বায়ু-সেবন। বিকেলে যখন আমরা নদীর ধারে বা খোলা মাঠে বেড়াতে বেরোই, তখন দুইই ভালোরকম হতে থাকে। নাক দিয়ে মুক্ত বায়ু গ্রহণ এবং গা দিয়ে বায়ু সেবন দুটোরই প্রয়োজন আছে, এ-কথা আমাদের মনে রাখা দরকার।

আহার ও উপবাস

সকল জীবকেই খেয়ে বাঁচতে হবে। কিন্তু বিভিন্ন জাতের জীবদের খাবার ব্যবস্থা বিভিন্ন রকমের। যারা শিকারী ও হিংস্র জাতের প্রাণী, অর্থাৎ অন্যান্য জীবদের হত্যা করে খাওয়া ছাড়া যাদের বাঁচার অন্য উপায় নেই, যেমন বাঘ, সিংহ প্রভৃতি, তারা তো অনেক দিন খেতেই পায় না। কবে আহার জুটবে, তার কোন ঠিক নেই, তাই বহু দিন না খেয়েও তারা বেঁচে থাকে। আবার গরু, ছাগল প্রভৃতি যারা উদ্ভিজ্জ-ভোজী নিরীহ প্রাণী, তারা প্রত্যহ সারাদিনই খাচ্ছে, তারপরে সারা রাত তাই নিয়ে জাবর কাটছে, এই খাওয়ার ব্যাপারে সর্বক্ষণ লিপ্ত থেকে রাত্রে পর্যন্ত তাদের ঘুম নেই। কিন্তু মানুষের পক্ষে সবই সুনির্দিষ্ট ও নিয়মিত হওয়া চাই। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে নিয়মিত-ভাবে নিয়মিত রকমের খাদ্য তাকে নিয়মিত পরিমাণে খেতে হবে। আদিম জগতের বা অসভ্য জাতের মানুষদের বেলা খানিকটা অনিয়ম চলতে পারে, কিন্তু সভ্য সমাজের বেলা তাও চলবে না। কারণ নিয়মে থাকতে এবং নিয়মে খেতেই সে অভ্যস্ত হয়েছে, অনিয়ম তার ধাতে সইবে না। বেহিসেবী খাওয়া জন্তু-জানোয়ারের চলে, মানুষের চলে না।

মানুষ কেউ বা দিনে চার পাঁচবার খায়, কেউ বা তিনবার, কেউ বা দু'বার, কেউ বা একবার মাত্রও খেয়ে থাকে, যে যেমন অভ্যাস করেছে। রীতিমত অভ্যাস করা থাকলে পাঁচবার খেয়েও কোনো ক্ষতি হয় না। আমাদের পেটের ভিতরকার হজম যন্ত্রগুলির ক্ষমতা অতি আশ্চর্য, ধীরে ধীরে এবং ক্রমে ক্রমে তাদের যা সওয়াবে তাই সইবে। প্রত্যহই তাদের ঘাড়ে খাদ্যের বোঝা চাপিয়ে যাচ্ছি, একটি

দিনের জন্যও বিরাম দিচ্ছি না, আর প্রত্যহই তারা নির্বিবাদে তা হজম করে চলেছে, কোনোদিনই হজমযন্ত্রের ডিউটির কামাই নেই। তাদের যতখানি ক্ষমতা, সেই ওজন বুঝে নিয়মিত ডিউটি দিলে তারা নিয়মিত-ভাবেই কাজ করে যাবে, কখনও কোনো ব্যতিক্রম ঘটবে না। কিন্তু যদি অতিরিক্ত অনিয়ম অত্যাচার করা হয়, ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ যদি তাদের ঘাড়ে চাপানো হয়, তাহ'লে আর তারা সেটা সহ্য করতে পারে না। তারা তখন প্রতিবাদ জানাতে থাকে। তবুও অত্যাচার চলতে থাকলে তখন তারা বেঁকে বসে। তারই ফলে হয় ডিস্‌-পেপ্‌সিয়া নামক দুরারোগ্য অবস্থা।

কেবল আমাদের দেশে কেন, পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেরই লোক আজকাল ডিস্‌পেপসিয়াতে ভোগে। এমন লোক খুব কমই আছে যারা নিঃসংকোচে বলতে পারে যে, তাদের হজমের কোনো গণ্ডগোল হয় না, এদিক দিয়ে তাদের অভিযোগ করার কিছু নেই। আর যাদের অজীর্ণ বা ডিসপেপ্‌সিয়ার ধাত এসে গেছে, তাদের তো কোনো কথাই নেই, তারা বলবে যে, হাজার সাবধান থাকলেও তাদের হজমযন্ত্র নিত্য বিগড়েই আছে। যন্ত্রগুলোই তাদের খারাপ। এ-কথা তাদের বোঝানো কঠিন যে, এমন হয়েছে তাদের নিজেদের দোষে।

কোল ভীল সাঁওতালদের কি ডিসপেপ্‌সিয়া হয়? তাদের মধ্যে এটা খুব কমই দেখা যায়। তারা ঘড়ি ধরে নিয়মিত সময়ে অবশ্যই খায় না, কিন্তু ওরই মধ্যে তাদের খাওয়ার মোটামুটি একটা নিয়ম আছে, সে নিয়ম তারা মেনে চলে। আর তারা খায় মোটা লাল চালের শক্ত শক্ত ভাত কিংবা চাপড়া রুটি, তার সঙ্গে শাকপাতাও কিছু থাকে, কিংবা শিকার কিছু জুটলে তাও থাকে। এই সব সামান্য খাদ্য তারা দাঁত দিয়ে রীতিমত চিবিয়ে খায়, দাঁতকে দিয়ে এবং অন্যান্য যন্ত্রকে দিয়ে তারা পুরোপুরি ডিউটিগুলি করিয়ে নেয়। কিন্তু ঐ ছাড়া তাদের

উপর অন্য দিক দিয়ে কোনো অত্যাচার করবার সুযোগ নেই। কাজেই হজমযন্ত্র তাদের সহজে বিগড়াতে পারে না।

কিন্তু সভ্যমানুষদের বেলা কি হয়? প্রথমত আমরা তো দাঁতকে ভালো করে চিবোতেই দিই না। পাছে অনেকক্ষণ যাবৎ বসে বসে চিবোতে হয়, তাই এমন সব গলা-গলা নরম খাদ্য খেয়ে থাকি, যা না চিবিয়েই তাড়াতাড়ি কোঁৎ করে গিলে ফেলা যায়। মিহি চালের নরম ভাত, অতি সিদ্ধ নরম নরম আলু, পটোল, বেগুন, নরম নরম মাছ-মাংস—সবই খাওয়া চাই নরম। যাতে দাঁতকে আর পাকস্থলীর মাংস-পেশীকে আদৌ কোনো পরিশ্রম না করতে হয়। আর হজমের দুর্বলতা থাকলো তো কথাই নেই, তখন আমাকে আরো বেশী নরম করতে হবে—অর্থাৎ ধারণাটা এই যে, খাদ্য যত বেশি নরম হবে, ততই তা বেশি সহজপাচ্য হবে। অথচ এদিকে কিন্তু যন্ত্রগুলির উপর যথেষ্ট অত্যাচার চলতে থাকে অন্যভাবে। পঞ্চব্যঞ্জন ও পঞ্চোপকরণে ঝাল, মসলা, তেল, ঘি প্রভৃতি তো প্রচুর পরিমাণে দেওয়াই চাই, তার সঙ্গে যথেষ্ট মিষ্টিও থাকা চাই, নইলে আহার্য মোটে মুখরোচক হবে না। ফলে কিন্তু কোনো খাদ্যটাই স্বাভাবিক থাকে না, কোনো খাদ্যেরই স্বাভাবিক আস্বাদ মেলে না, যা মেলে তা ঐ ঝাল, মশলা ও তেলেরই আস্বাদ। চপ, কাটলেট খেলাম, কিন্তু তা এমন তরিবৎ করে বানানো যে, মাংসের, না মাছের, না নিরামিষের প্রস্তুত তা বোঝাই গেল না, পেলাম কেবল তার আনুষঙ্গিক মশলাগুলিরই অপূর্ব এক মিশ্রিত আস্বাদ। এদিকে দাঁতের ও জিভের অব্যবহার ও অপব্যবহার, অন্য-দিকে হজমযন্ত্রের উপর এই সব অত্যাচার। তার উপরে কাপের পর কাপ চা কিংবা কফি, আইস্ক্রীম, অতিরিক্ত ধূম পান, মদ্য পান প্রভৃতি একাধিক উপসর্গ তো আছেই। এমনি নানাভাবে সভ্য মানুষদের হজম যন্ত্রের উপর খুবই অত্যাচার হয়ে থাকে।

আর অজীর্ণতা বা গরহজম হলেই আমরা ভাবি যে, এও একটা নবাগত রোগবিশেষ, যেমন সর্দি-কাশি প্রভৃতি হয়ে থাকে, নিজেদের দোষে তো হয়নি, হয়েছে হয়তো একটা কিছু কারণে, ওষুধ খেলেই ওটা সেরে যাবে। তাই প্রথমে নিজে নিজে, তারপরে, ডাক্তারের পরামর্শে নানা রকমের হজমী ওষুধ খাওয়া চলতে থাকে। কিন্তু হজমের দোষটি কিছুতেই সারে না। কারণ খাওয়ার অত্যাচারগুলি তখনও আগের মতোই চলছে, যথেষ্ট সাবধান হলেও তারই ভিতর দিয়ে সব কিছুই চলতে থাকে, সুতরাং রোগটি ক্রমশ ক্রনিক অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ায়।

হজমযন্ত্র কোনো কারণে বিকল হলেই প্রথম কর্তব্য হলো তাকে বিশ্রাম দেওয়া, এবং তার পরের কর্তব্য হলো পুনরায় যাতে সেগুলি বিকল না হয়, তারই ব্যবস্থা করা। আরো বিশেষ করে দেখা উচিত, যাতে কখনও খাওয়া সম্বন্ধে একটুও অনিয়ম বা অত্যাচার না হয়। আমাদের হজমযন্ত্র যাতে বিকল না হয় তারজন্য কতকগুলি নিয়ম পালন করা দরকার।

প্রথমত অসময়ে খাওয়া কিছুতেই উচিত নয়। যখনই দেখা যাবে যে খাবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তখনই সে খাওয়াটি একেবারে বাদ দিয়ে দিতে হবে। এতে হজম-যন্ত্র খুব ভালো থাকে, কারণ একবারের পরিশ্রম থেকে যন্ত্রগুলি ছুটি পেয়ে গেল, তার কিছু বিশ্রাম হলো। অসময়ে খেলে তার উপর অত্যাচারই করা হতো।

দ্বিতীয়ত, যখনই দেখা যাবে যে, ইতিপূর্বে যা খেয়েছি তা ভালো করে হজম হয়নি, পেটের মধ্যে কিছু উদ্বেগ রয়েছে বা অক্ষুধা রয়েছে, তখনই পরবর্তী খাওয়াটি বাদ দিয়ে দেওয়া উচিত। একে বলে লঙ্ঘন দেওয়া। হজমের কিছু ব্যতিক্রম দেখলে কিংবা গুরুভোজন হয়ে থাকলে এক বেলার খাওয়া কিংবা একটা দিনের খাওয়া বাদ দিয়ে দিলে তাতেই

অনেক দোষ কেটে যায়, ওষুধ প্রভৃতি খেয়ে কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের কোনো প্রয়োজন হয় না।

উপবাস দেওয়াও এক রকমের উৎকৃষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি। অনেক রকম রোগেই উপবাস দিতে বলা হয়। যাদের নিত্যই ডিসপেপ্‌সিয়া হয়, তাদের পক্ষে খাদ্যরীতি ও খাদ্যতালিকা আমূল পাল্‌টে দেওয়া দরকার, এবং তার পূর্বে দুই বা তিনদিনের জন্য একটা লম্বা উপবাস দিয়ে তারপরে নতুন রকমের খাদ্য ব্যবস্থার প্রবর্তন করলে অনেক ক্ষেত্রে খুবই ভালো ফল পাওয়া যায়। এই উপবাস দিয়েই তাদের খাদ্য-সংস্কার ও চিকিৎসা শুরু করতে হয়।

তবে উপবাস মানে নিরম্বু উপবাস নয়। এতে জল খাওয়া বন্ধ করবার দরকার নেই। প্রয়োজন হলে সেই সঙ্গে আরো একটি জিনিস খাওয়া চলতে পারে, তা হলো ফলের রস। অন্যান্য ফলের চেয়ে কমলালেবুর রসই এ পক্ষে ভালো। সেই ফলের রস কিন্তু এমনি খাওয়া চলবে না, তাহ'লে তো একরকম খাদ্যই খাওয়া হলো। ফলের রসটি খেতে হবে প্রচুর জল মিশিয়ে, যতটা রস ততটা জল। এমনিভাবে দিনের মধ্যে চারবারও খাওয়া যেতে পারে। ব্যস্‌, এই ছাড়া কিন্তু আর কিছুই না। চা-ও না। নিতান্ত যারা চা-খোর, একবার একটু চা না খেলে যারা কোনোমতে থাকতেই পারবে না, তারা খুব পাতলা করে একটু চায়ের লিকার লেবুর রস মিশিয়ে একবার মাত্র খেয়ে নেবে। এই উপবাসের সময় ধূমপানও বন্ধ করে দিতে হবে এবং পান-জর্দা খাওয়াও বন্ধ করতে হবে। আর উপবাসের এই তিনটি দিন নিয়মিতভাবে কাজে না গিয়ে ছুটি নিয়ে ঘরে চুপচাপ শুয়ে থাকাই ভালো। এমনিভাবে দুই বা তিনদিনের উপবাসে শরীর যে খুবই দুর্বল হয়ে পড়বে, এমন আশঙ্কা করা ঠিক নয়। প্রথম দিনটায় অবশ্য খাবার সময়টিতে খেতে বড় ইচ্ছে হবে, দুই তিন দফা

খাবার সময় অভুক্ত থেকে গেলে তখন একটু দুর্বল বোধ হতেও থাকবে আর হয়তো একটু মাথা ঘুরবে। কিন্তু ওটুকু কষ্ট সহ্য করে যেতে হবে। দ্বিতীয় দিনে দেখা যাবে যে, ঐরূপ কষ্ট অনেক কম, তৃতীয় দিনে আরো কম। নির্দিষ্ট খাবার সময়টিতে খানিক জল খেয়ে নিলেই আর কোনো বিশেষ কষ্ট বোধ হবে না। দ্বিতীয় দিন থেকে দেখা যাবে যে, খাবার আর তেমন ইচ্ছাই হচ্ছে না, না খেয়েই বেশ ভালো আছি।

এমনিভাবে উপবাস দিলে হজম যন্ত্রগুলি প্রচুর বিশ্রাম পেয়ে যাবে এবং শরীরটিও সম্পূর্ণ সুস্থ ও ঝর্‌ঝরে বোধ হতে থাকবে। তার পরে চতুর্থ দিনের সকাল থেকে অল্প অল্প খেতে শুরু করবে। ঐ দিনটিতে শক্ত খাবার খুবই কম খাবে। তারপর ধীরে ধীরে খাদ্যের পরিমাণ বাড়াতে থাকবে এবং দেখবে যে, কোন্ ধরনের খাদ্য কতটুকু খেলে হজমের কিছু বিঘ্ন হচ্ছে না। আর এখন থেকে রীতিমতভাবে চিবিয়ে খেতে অভ্যাস করবে। খাদ্যের তালিকাও অতঃপর অদল-বদল করে দেখবে কোন্‌টা তোমার সয়, আর কোন্‌টা সয় না।

এমনি উপবাস চিকিৎসা বাতের পক্ষেও খুব উপকারী, আর রক্ত-চাপ বৃদ্ধি নিবারণের পক্ষেও উপকারী। অতিরিক্ত স্থূলতা রোগের পক্ষেও এ চিকিৎসা খুবই ভালো। যাদের দেহে অতিরিক্ত চর্বি সঞ্চিত হয়েছে তাদের পক্ষে প্রতি সপ্তাহে একদিন করে উপবাস দেওয়াতে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। আমাদের দেশে যে পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও একাদশীর দিনে উপবাস করার রীতি ছিল, তাও অনুসরণ করা যেতে পারে।

মাঝে মাঝে উপবাস দেওয়া সকলের পক্ষেই ভালো। কিন্তু আমরা অল্পবয়সের সম্বন্ধে একথা বলছি না, পরিণত বয়সের সম্বন্ধেই বলছি।

ওজনের কমা বাড়া

দুই জাতের মানুষদের কাছে দুই রকমের নালিশ শোনা যায়। যারা রোগা মানুষ তারা বলে, যতই বেশী খাই তবু কেন মোটা হই না। যারা মোটা মানুষ তারা বলে যতই কম খাই তবু কেন রোগা হই না। এর কারণও আছে এবং তার প্রতিকারও আছে ; কিন্তু তা জানতে হলে রীতিমত বৈজ্ঞানিকভাবে কতকগুলি কথা বুঝে দেখা দরকার।

প্রথম কথা, মোটা বা রোগা হওয়া সম্বন্ধে বয়সের একটা স্বাভাবিক গণ্ডী টানা আছে। জীবনের প্রথম অংশটায় সকলের মোটা হওয়াই দরকার, শেষের অংশটায় কিন্তু মোটা না-হওয়াই দরকার। বাল্য ও ও কৈশোর থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত দেহের বাড়ের সময়, তখন আয়তন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ দেহের ওজন বেড়ে যেতে থাকাই স্বাভাবিক। তখন পুষ্ট না হওয়া অর্থাৎ না-বাড়াটা ক্ষতি। তখনকার বয়সে ওজন না বাড়লে এবং রোগা হতে দেখলে বুঝতে হবে যে, দেহের সমুচিত বাড় হচ্ছে না, পূর্ণ পরিণতি লাভের পথে সে অগ্রসর হচ্ছে না। এর সময়মত প্রতিকার হওয়া চাই।

পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত মানুষের বাড় হবার সময়। এই বয়সের মধ্যে দেহের ওজন ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকলে দোষ নেই, কিন্তু কমতে থাকলে তা দোষের। এ বিষয়ে একটা মোটামুটি আন্দাজ দেওয়া যাক। পঁচিশ বছর বয়সে পাঁচ ফুট লম্বা একটি পুরুষের দেহের ওজন অন্তত দেড় মণ (১২০ পাউণ্ড) হওয়া চাই, তার কম হওয়া অনুচিত। এটা হলো আন্তর্জাতিক মাত্রা, বাঙালীদের বেলা এর দু'চার সের কম হলেও ক্ষতি নেই, আর মেয়েদের বেলাতেও সেই কথা। কেউ যদি পাঁচ ফুটের চেয়ে কম লম্বা হয় তাহলে সেই অনুসারে

প্রতি ইঞ্চিতে দুই সের কম হিসাবে ধরতে হবে, বেশী লম্বা হলে প্রতি ইঞ্চিতে এক বা দুই সের বেশী ধরতে হবে। ত্রিশ বছর বয়স হলে পাঁচ ফুট লম্বা মানুষের ওজন ১২৬ পাউণ্ডে গিয়ে দাঁড়াবে, ১৩০শে গিয়ে দাঁড়ালেও ক্ষতি নেই, কিন্তু তার বেশী নয়। বাঙালীদের বেলা বরং কিছু কমই হবে। কিন্তু এই ওজনের পর থেকে আর খুব বেশী বাড়া উচিত নয়, যা বাড়বে আরো বেশী বয়সের সঙ্গে তা অতি সামান্য। পঞ্চাশে গিয়ে ঐ ওজন দাঁড়াবে ১৩৫ পাউণ্ড থেকে ১৪০ পাউণ্ডের মধ্যে, তার বেশী নয়—অবশ্য পাঁচ ফুট লম্বার পক্ষে। বেশী লম্বা হলে সেই অনুপাতে ওজনও বাড়বে। এই হলো একটা মোটামুটি হিসেব।

কিন্তু আমরা বলছিলাম ত্রিশে পর্যন্ত পেঁৗছাবার আগেকার কথা। ঐ বয়সে ওজন ক্রমশ বাড়াই দরকার, কমা কোনোমতেই উচিত নয়। ওজন বাড়ছে না, মানেই দেহও বাড়ছে না, তার যতখানি বিকাশ হবার কথা তা হচ্ছে না, ব্যক্তির স্বাস্থ্যকে সেই পরিমাণে খর্ব করা হচ্ছে। আজকাল আমাদের দেশের অধিকাংশ যুবকদেরই ওজন উচিত অপেক্ষা কম হতে দেখা যায়। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেই যে ওরূপ হয় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক শিক্ষিত যুবকদের মধ্যেও, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় যে, সেই অভাব তাদের ইচ্ছাকৃত। ইচ্ছা করেই তারা কম পরিমাণে খায়, যাতে দেহ মোটা না হয়ে বেশ 'স্লিম্' থাকে। তাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, বেশী 'স্লিম্' হওয়া ঐ বয়সে কখনই ভালো নয়। দেহস্থ কোষগুলিকে এই ভাবে অভুক্ত রাখলে তারা স্বাস্থ্য ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে, তাদের রোগ-প্রবণতা বেড়ে যায়, কোনো রোগের সংক্রমণ এসে পড়লে তাকে আর ঠেকানো যায় না। বিশেষত যদি ঐ বয়সের মধ্যে দেখা যায় যে, কারো ওজন বাড়া কিংবা স্থায়ী হওয়ার বদলে ক্রমশ কমের দিকে যাচ্ছে, তাহলে তা গুরুতর ভাবনার কথা। এরূপ অবস্থাকে তাচ্ছিল্য করা কখনই উচিত

নয়। যদি দেখা যায় যে, খাওয়া কমেনি কিন্তু ওজন কমে যাচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে যে এর নিশ্চয় কিছু কারণ ঘটেছে, ডাক্তার দেখিয়ে সে কারণ খুঁজে বের করা উচিত। বলা যায় না, তাদের মধ্যে হয়তো কিছু বুকের দোষ, বা দাঁতের দোষ, বা পেটের দোষ বেরিয়ে পড়বে, কিংবা প্রায়ই দেখা যাবে যে, তাদের সমুচিত পুষ্টির অভাব হচ্ছে। তাদের দিতে হবে বেশী পরিমাণে শক্তিবর্ধক ও ওজনবর্ধক খাদ্য। নতুবা তাদের অনিষ্ট হবে।

শক্তিবর্ধক খাদ্য বলতে কোন্‌গুলিকে বোঝায়? কার্বোহাইড্রেট খাদ্যই হলো দেহমধ্যে শক্তি উৎপাদনের সেরা ইন্ধন। সেইজন্যই আমরা দুর্বল রোগীদের শরীরে গ্লুকোজ প্রয়োগ করি। যে খাদ্য থেকে প্রচুর গ্লুকোজ প্রস্তুত হয়, সেই খাদ্যই এ স্থলে খাওয়া উচিত। অর্থাৎ একদিক থেকে ভাত রুটি ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাওয়া বাড়িয়ে দেওয়া দরকার, এবং অন্যদিক থেকে এনার্জি বাড়াবার জন্য দুধ, ঘি, মাখন প্রভৃতি স্নেহপদার্থগুলিও খাওয়া দরকার। ঘি খাঁটী না মিললে তার বদলে মাখন, এবং তেল খাঁটী না মিললে তার বদলে ওলিভ অয়েল বা তিলের তেল ব্যবহার করা যেতে পারে। বনস্পতি জাতীয় ভেজিটেবল ঘি এখানে উপকারী হবে না।

কিন্তু শুধু খাওয়া বাড়ালেই চলবে না। খাওয়াগুলি যাতে ঠিক ঠিক হজম হতে থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রয়োজন হলে তার জন্য ওষুধের সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক উপায়ে যাতে হজমশক্তি ও ক্ষুধা বাড়ে সেই চেষ্টাই আগে করা উচিত। তার জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় কিছু শারীরিক ব্যায়াম করা। রোগা চেহারার লোককেও ব্যায়াম করতে বলছি, কারণ ক্ষুধা ও হজমশক্তি বাড়াতে ওটাই দরকার। খুব বেশী মেহনতের ব্যায়াম নয়, অল্পস্বল্প মেহনতের কাজ, যেমন দ্রুতবেগে হাঁটা, ক্রিকেট ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি

খেলা। আর এক উৎকৃষ্ট উপায় সর্বক্ষণ খোলা বাতাসে থাকা। রাত্রে খোলা বাতাসে শোয়া এর পক্ষে খুবই উপকারী। পরীক্ষা ক'রে দেখলে সবাই বুঝতে পারবেন। যারা শহরে থাকে তাদের বাইরে কোথাও চেঞ্জে গেলে ক্ষুধা বেড়ে যায় খোলা বাতাসের কারণেই।

ত্রিশ বছর পর্যন্ত বয়সের পক্ষেই ঐ কথাগুলি বললাম। কিন্তু তার পর থেকে যখন বয়স আরো বাড়বে তখনকার পক্ষে সম্পূর্ণ অন্য রকমের কথা। ওর পর থেকে দেহের ওজন আর বেশী বাড়া উচিত নয়। আদর্শ নিয়ম এই হবে যে, ত্রিশ বছরে যার যেমন ওজন আছে তাই বরাবর বজায় থাকবে, বয়স ক্রমশ বাড়তে থাকলেও ওজন কিন্তু আর বাড়বে না, অর্থাৎ ওজনকে আর বেশী বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না। মানুষের দেহের আকার মোটামুটি তিন রকম হয়ে থাকে—কৃশ, মাঝারি ও মোটা। এটা বলছি স্বাভাবিক কাঠামোর কথা। কৃশ চেহারার লোকেরা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত কৃশই থাকে, মোটা লোকেরা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সেই ধরনেরই থাকে। কিন্তু যার যেমনই চেহারার ধরন হোক, ত্রিশ বছর বয়সের পর থেকে তার দেহের ওজন আর ওর চেয়ে বড় জোর দুই চার সেরের বেশী বাড়া উচিত নয়। এই বয়সের পর থেকে ওজন বাড়া মানেই দেহের চর্বি বাড়তে থাকা, কারণ হাড় মাংসের তরফে বাড়বার কিছু আর বাকী নেই, যা বাড়বার ছিল তা ত্রিশের মধ্যেই চুকে গেছে। সে স্থলে কেবল চর্বির মাত্রাই বেড়ে যেতে থাকলে তাতে ক্ষতি আছে। ওতে হার্টের উপরেও চর্বি জমে, তাতে হার্ট দুর্বল হয়ে যায়। শিরার দেয়ালগুলিও চর্বিযুক্ত হয়ে তাতে রক্তের চাপ অর্থাৎ ব্লাড্‌প্রেসার বেড়ে যায়। আর ডায়েবিটিস রোগও দেখা দিতে পারে। আর চর্বি বাড়লেই দেহের স্ফূর্তি কমে যায়, দেহভার যেন গুরুভার বোঝার মতো হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্যবান থাকা ও দীর্ঘায়ু লাভ করার পক্ষে এটা অনুকূল নয়। ত্রিশের পরে

মধ্যবয়সে বরং ওজন কমে যাওয়াই ভালো, তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। মধ্যবয়সের পরে যাদের ওজন কমে যায় আর চর্বি খানিকটা ঝরে যায়, তারা বরং দীর্ঘায়ুই হয়ে থাকে।

কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিত ভদ্রসমাজে অনেক স্থলে এর বিপরীত জিনিসটাই হতে দেখা যায়। ত্রিশের পর থেকেই তাঁরা রীতিমত কিছু উপার্জন করতে শুরু করেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় যে, তাঁদের ভুঁড়ি বাড়তে শুরু করেছে। তার কারণ অর্থের স্বচ্ছলতা হওয়াতে পাঁচরকম খাওয়া-দাওয়ার বাহুল্য বেড়েছে। কিন্তু এতে যে স্বাস্থ্যের হানি করা হচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য নেই।

মেদবহুল মোটা লোকদের দেহের ভিতরকার কর্মঠ কোষের সংখ্যা রোগা লোকদের কর্মঠ কোষের সংখ্যার চেয়ে প্রায়ই অনেক কম, কারণ তাদের দেহের মেদ-কোষের সংখ্যাই অনেক বেশী, আর সেই সব মেদকোষগুলি একেবারে নিষ্ক্রিয়, জায়গা জুড়ে বসে থাকা ছাড়া তাদের আর কোনো কাজ নেই। আর তাদের দেহের কর্মঠ কোষেরাও অপেক্ষাকৃত অলস, কারণ তাদের ইঞ্জিনে কয়লা ভর্তিই আছে, আর বেশী কয়লার ইন্ধনের দরকার নেই। সেইজন্য চর্বিযুক্ত মোটা মানুষরা বেশী খাটতেও চায় না, বেশী খেতেও চায় না। পরিশ্রমের অভাবে যতটুকু তারা খায় ততটুকুতেই আরো বেশী মোটা হ'তে থাকে। তাই তাদের মুখে প্রায়ই এ কথা শোনা যায় যে, খাওয়া তো প্রায় নেই বললেই হয়, তবু ক্রমশ মোটা হয়ে যাচ্ছি— এ একটা ব্যাধি আর কি।

এই স্থূলতা ব্যাধির প্রতিকারের জন্য অনেকে বলে এক্সেরসাইজ করো। অবশ্য এ পরামর্শ যুক্তিহীন নয়, কিছু মেহনত তো করাই উচিত, কিন্তু ভদ্রশ্রেণীর মোটা মানুষ দেহের গুরুভার নিয়ে কতটাই বা কী মেহনত করবে? তাদের কসরত বা ছুটোছুটি করতে বলায় বিপদ আছে, হৃৎপিণ্ড হয়তো তার ধকল সইতে পারবে না। আর কঠিন

মেহনতেও বাস্তবের পক্ষে চর্বির পরিমাণ তেমন বিশেষ কমে না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে আট ঘণ্টা হাঁটলে বা চার ঘণ্টা চড়াই পাহাড়ে উঠলে তাতে দুই ছটাক মাত্র চর্বি কমে। সুতরাং মেহনত যদিও কিছু অবশ্যই করা উচিত, কিন্তু তাতে চর্বি কমবে এমন মনে করা ভুল।

কেউ কেউ ওষুধের দ্বারা চর্বি কমানোর মতলব করেন। কেবল যদি কোনো গ্ল্যাণ্ডের দোষে চর্বি জমে থাকে, তবেই কোনো সুদক্ষ চিকিৎসকের দ্বারা সেরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, নতুবা এতে বিপদ আছে। কেউ কেউ দেহের মাসাজ্ অর্থাৎ দলাইমলাই করান; ওতে আরাম আছে বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওজন কমে না। কেউ কেউ টার্কিশ বাথ নিয়ে থাকেন; এতে ঘাম বেরিয়ে শরীর হাল্‌কা হয়ে যায় বটে, কিন্তু জল খেলেই আবার যে-কে সেই। মোটা হলে কেউ কেউ আবার জল খাওয়াই অনেক কমিয়ে দেন; আহারের সময় বেশী জল না খাওয়া মোটা মানুষের পক্ষে উপকারী, কিন্তু একেবারে জলের মাত্রা কমিয়ে দিলে কিড্‌নির কাজ কমে গিয়ে তাতেও অন্যদিকে অনিষ্ট হতে পারে।

এই সকল কৃত্রিম ব্যবস্থা ছেড়ে দিয়ে সব চেয়ে সহজ ও সাফল্য-দায়ক উপায় হলো, যে সব খাদ্যের দ্বারা চর্বির সৃষ্টি হচ্ছে, বেছে বেছে সেই খাদ্যগুলি খাওয়া খুব কমিয়ে দেওয়া। খাওয়া বন্ধ ক'রে উপবাসী হয়ে থাকা নয়, কেবল অভ্যস্ত খাদ্যতালিকাটিকে আমূল পাল্‌টে দেওয়া। কোন্ কোন্ খাদ্যে চর্বি জন্মায়? (১) ভাত ও রুটি, (২) মিষ্টি খাবার, (৩) ঘি, তেল, চর্বি, মাখন। এগুলি খাওয়া যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলতে হবে। কতখানি কমানো দরকার তা নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে। যতটা কমালে দেহের ওজন কমতে শুরু হয় ততটাই কমানো চাই, আর সেই মাত্রাতেই থাকা চাই। মোটা হবার বিষয়ে কেবল ঐগুলিই দায়ী, অন্য কোনো খাদ্য নয়।

মোটা করা খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি ভুল ধারণা আছে। ভাত খেলে মোটা হয়, রুটি খেলে হয় না, এটা ভুল কথা, কারণ ইন্ধনমূল্য দুয়েরই সমান। কমাতে হলে দুইই কমাতে হবে। ভাত ছেড়ে এক দিস্তে রুটি খেয়ে কোনোই লাভ নেই। ভাত বা রুটি কোনোটাই একেবারে ছাড়তে বলা হচ্ছে না, পরিমাণে খুব কমিয়ে দিতে বলা হচ্ছে। তবে কী দিয়ে পেট ভরবে? কেন, আরো তো অনেক রকম খাদ্য আছে। দুধ, মাছ, মাংস (চর্বিযুক্ত নয়), ডিম, এগুলো বন্ধ করতে বলা হচ্ছে না। শাক-সব্জি, আনাজ তরকারি (আলু বাদ দিয়ে) ও ফলাদি খেয়ে পেট ভরানো যেতে পারে। ভাত বা রুটির বদলে ঐ সব দিয়েই পেট ভরানো অভ্যাস করতে হবে। আনাজ তরকারিতে যথেষ্ট ভিটামিন থাকে, ঐগুলি প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়। কিন্তু তা ঘি তেল বা মিষ্টি দিয়ে গর্‌গরে করে রাঁধলে চলবে না। ঘি আর তেল তো বর্জনই করতে হবে, আর মিষ্টিও। কোনো মিষ্টিই খাওয়া উচিত নয়, মোটা মানুষদের পক্ষে। চায়ে পর্যন্ত খুব কম চিনি। সন্দেশ, রসগোল্লা বাদ। জলখাবারের সময় ছোলা ভিজানো বা ডাল ভিজানো, নানারূপ ফলটল, দই, ছানা প্রভৃতি বেশ চলবে। এইরূপ ব্যবস্থা করলে পেটও ভরতে পারবে, ওজনও কমতে থাকবে। যাঁরা বলেন, খাওয়া কমিয়েও ওজন কমছে না, তাঁরা এমন ব্যবস্থা নিশ্চয়ই কখনো ক'রে দেখেননি।

অভ্যস্ত খাওয়া বদলে দিলে প্রথমটায় ঐসব খাবার কিছু পরেই পেট খালি বোধ হতে থাকে। সেরূপ হলে তখন আবার কিছু খেয়ে নেওয়া চলতে পারে। দেহকে কষ্ট দিয়ে পেট খালি রাখতে বলা হচ্ছে না। কিন্তু দেহের গুরুভার যদি কমাতে চাও, সুস্থ শরীরে যদি দীর্ঘায়ু লাভ করতে চাও, তাহলে প্রচুর ভাত খাওয়া, প্রচুর মিষ্টি খাওয়া, আর ঘি তেল দেওয়া খাদ্যব্যঞ্জনাদি খেতে থাকা ছেড়ে দেওয়াই নিশ্চয় দরকার।

তিত নুন টক ও ঝাল

কোনো জিনিস খেতে হলে আগে তার আস্বাদটি আমাদের জিভের অনুমোদিত হওয়া চাই। নইলে তা আমরা খেতে চাইব না। খাদ্য-প্রবেশের দরজায় জিভটি রয়েছে সদাসতর্ক দ্বাররক্ষী, অবাঞ্ছিত খাদ্যকে সে কোনোমতে ভিতরে ঢুকতে দেবে না, থু করে বাইরে বের করে দেবে। খাদ্যের আস্বাদের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই আগে এই নিপুণ দ্বাররক্ষী আস্বাদ-যন্ত্রটির কিছু আভ্যন্তরীণ পরিচয় দেওয়া দরকার।

জিভ কি তার সকল অংশ দিয়েই সব জিনিসের আস্বাদ পায়? তা নয়। জিভের উপর দিকে কতকগুলি বিশেষরকম আস্বাদ-ঘাঁটি থাকে, তার নাম আস্বাদকোরক। এই আস্বাদকোরক খাবার সময় ভিজে ছাড়া থাকে না, কারণ তরল ও ভিজে ছাড়া কোনো শুষ্ক জিনিষের শুষ্ক আস্বাদ এরা নিতে পারে না। সব জিনিষকেই আগে খানিকটা ভিজিয়ে নেওয়া চাই, অর্থাৎ তরল অবস্থায় এনে তার সূক্ষ্মতম অ্যাটমগুলিকে কিছু বিক্ষিপ্ত ও বিশ্লিষ্ট করে ফেলা চাই, তবেই এই আস্বাদকোরকের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নার্ভতন্তুগুলি তাকে ধরে নিয়ে তার আস্বাদকে সঠিক অনুভব করতে পারবে। সেখানে তখন যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হবে তা কতকটা ইলেক্‌ট্রিক কারেন্টের মতো ব্যাপার।

বাষ্পীয় জিনিসেরও এমনিভাবে আঘ্রাণ নেওয়া যায় নাক দিয়ে, আর তরল জিনিসের আস্বাদ নেওয়া যায় জিভ দিয়ে। নাকের আঘ্রাণ ও জিভের আস্বাদ কার্যতঃ একই ব্যাপার।

যার জিভে যত আস্বাদকোরক আছে তার তত বেশী আস্বাদ নেবার শক্তি। আমাদের জিভে আস্বাদকোরক থাকে প্রায় তিন হাজার।

কিন্তু গরুদের জিভে আছে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার। গরুদের আস্বাদ শক্তি আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। হরিণের তা আরো বেশী।

গরম গরম জিনিসগুলি খেতে যতটা আস্বাদ মেলে, সেই জিনিসই ঠাণ্ডা খেলে তার আস্বাদ ততটা মেলে না। এর কারণ কি? কারণ এই যে, গরম অবস্থাতে তার মলিকিউল বা অণুগুলির গতিবৃদ্ধি হয়, সেগুলি আরো তাড়াতাড়ি বিক্ষিপ্ত হতে থাকে। সেইজন্য দেখা যায় যে, গরম চা-কে মিষ্টি করতে বেশী চিনি লাগে না, কিন্তু বরফ সরবৎ বা আইসক্রিমকে মিষ্টি করতে অনেক বেশী চিনি লাগে। ঠাণ্ডাতে মিষ্টির আস্বাদ কম পাই, গরমে বেশি পাই।

ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদের জন্য জিভের বিভিন্ন স্থানে আস্বাদকোরকের ভিন্ন গুচ্ছ জড়ো করা আছে। জিভের ডগাতে রয়েছে মিষ্টতাবোধের অধিকাংশ আস্বাদকোরক। তাই কোনো জিনিস মিষ্টি কিনা তা আমরা জিভের ডগাটি মাত্র ঠেকিয়েই বুঝে নিতে পারি, তার চেয়ে বেশীদূর অগ্রসর হওয়ার দরকার হয় না। এর একটু উপর দিকে জিভের দুই দিকের ধার ঘেঁষে রয়েছে নোন্‌তা-বোধের অধিকাংশ আস্বাদকোরকগুলি, সেখান দিয়েই আমরা বুঝতে পারি কোনো জিনিস নোন্‌তা কিনা। কোন্ খাদ্য কতটা নোন্‌তা হওয়া প্রয়োজন তা এরাই বিচার করে। এরও উপরে এবং জিভের দুই দিকের ধার ঘেঁষে রয়েছে টক্ বা অম্ল আস্বাদবোধের কোরকগুচ্ছ। এ ছাড়া জিভের পশ্চাদ্‌ভাগে অর্থাৎ প্রায় গোড়ার দিকে ভি-এর মতো সাজানো ৮।১০টি বড়ো বড়ো দানার মতো দেখা যায়, কেউ কেউ তাকে মনে করে যে, জিভের উপর বুঝি এক রকমের দানা উঠেছে—কিন্তু তা নয়, এগুলিও কোরকগুচ্ছ, অমনি দানার মতো ক'রে সাজিয়ে দেওয়া। ঐখানে রয়েছে তিক্ত আস্বাদবোধের কোরকগুলি। যা কিছু তিক্ত বস্তু খাবো, ঐখান দিয়েই তা মালুম হয়ে যাবে।

জিভের ডগা, তার দুটি ধার, এবং পিছনের ঐ দানার সীমানার মাঝখানে রয়েছে জিভের মধ্যক্ষেত্র। জিভের এই মাঝখানটুকুর কিন্তু কোনো আস্বাদবোধ নেই, আস্বাদ সম্বন্ধে এই অংশটি নির্বিকার, একে তাই বলা হয় "Zone of silence"। কুইনিনের বড়ি জিভের ঠিক মাঝখানে রাখলে তা তিত লাগবে না, কিন্তু যেমনি তা গিলবার সময় পিছনের কোরকে ঠেকে যাবে, অমনি গোটা মুখটাই তিত হয়ে উঠবে।

এই আস্বাদ জিনিসটি নির্ভর করে খাদ্যের রাসায়নিক দ্রব্যগুণের উপর। টক্ জিনিসে হাইড্রোজেন থাকবে, তার উল্টো ক্ষারীয় জিনিসে হাইড্রক্সাইড থাকবে। কিন্তু আমরা যে সব খাদ্য খেয়ে থাকি তাতে মাত্র এক ধরনেরই রাসায়নিক উপাদান থাকে না, বহু রকমের উপাদান একসঙ্গে মিশে থাকে। তাই বহু জিনিসেরই আস্বাদ একজাতীয় হয় না, দুই তিন রকমের আস্বাদ একত্রে বোধ করতে থাকা যায়। আম খেতে খুব মিষ্টিই লাগে, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রায়ই একটু টক্ রসও লাগবে। লেবু খেতে টক্ই লাগবে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটু তিত। ফটকিরি জিভে ঠেকালে প্রথমটায় মনে হবে টক্ লাগল, তার পরেই মনে হবে যেন একটু মিষ্টি। আবার আগে কিছু খেয়ে নিয়ে কতক-গুলি আস্বাদকোরককে অসাড় ক'রে দিলে তখন একরকম জিনিসের আস্বাদ অন্যরকম হয়ে যেতে পারে। হরিতকী চিবিয়ে নিয়ে তারপর যদি তিত জিনিস খাওয়া যায়, তখন আর তাকে তিত লাগবে না, বরং মিষ্টি লাগবে। চিনির সরবতের মধ্যে যদি এক চিম্‌টে নুন ফেলে দেওয়া যায় তবে তা আরো বেশী মিষ্টি হয়ে যাবে।

আর আস্বাদ মানে একটা অমিশ্র অনুভব নয়, ওর মধ্যে অনেক রকমের অনুভব মিশে থাকে। যা খাচ্ছি সেটা শক্ত কিঁ নরম, ঠাণ্ডা কি গরম, টাট্‌কা না বাসি, সুঘ্রাণ না কুঘ্রাণ, ভারী না হাল্‌কা, ঝাঁজালো না

মোলায়েম, ইত্যাদি অনেক খবর আস্বাদের সঙ্গে আমরা একত্রে টের পেতে থাকি। আস্বাদ আমাদের এক অতি সূক্ষ্ম বোধবৃত্তি। কান দিয়ে গানের সুরের যেমন নিপুণ সমঝদার হওয়া যায়, জিভ দিয়ে আস্বাদেরও তেমনি নিপুণ সমঝদার হওয়া যায়। কিন্তু আমরা এর অপব্যবহার করে থাকি।

দৈনিক আহারের ব্যাপারটা অনেক সময় আমাদের আস্বাদ-বিলাসের ব্যাপারে পরিণত হয়। এই আস্বাদ-বিলাস বাড়াতে বাড়াতে কখন যে আমরা সীমা অতিক্রম করে চলে যাই তা নিজেরা জানতেও পারি না। বস্তুত এই আস্বাদ-বিলাসের কারণেই যে আমরা নিজেদের দেহে কতরকম রোগের সৃষ্টি করি, আর কত যে নিজেদের অনিষ্ট করি তার কোনো ইয়ত্তা নাই। সেই সব বিলাস ক্রমশ এমন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় যে, অনিষ্ট হচ্ছে দেখলেও তখন আর তা ছাড়তে পারি না। তখন রসনা তৃপ্তির ফল নিদারুণ কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশে কোন্ আস্বাদ থেকে শুরু ক'রে কোন্ আস্বাদে গিয়ে খাওয়া শেষ করতে হবে তার একটা রীতি আছে।

সেই রীতি অনুসারে খেতে বসে প্রথমে খেতে হয় কিছু তিত জিনিস। পল্‌তার শুক্‌তো বা উচ্ছে ভাতে বা হিঞ্চে শাক, বা নিমবেগুন ইত্যাদি যখনকার যেমন মেলে। এতে জিভের অসাড়তা দূর করে, ক্ষুধা ও খাদ্যস্পৃহাকে উত্তেজিত করে। তিত জিনিস বেশী খাওয়া যায় না এবং তা মুখরোচক নয়, সুতরাং এ নিয়ে কোনো অত্যাচার ঘটতে পারে না।

তার পরেই আসে নোন্‌তা জিনিসের পালা। কেউ নুন একটু বেশী খায়, কেউ খায় কম। কিন্তু পার্থক্য খুবই সামান্য। খুব বেশী নুন কেউই খেতে পারে না। সুতরাং অতিরিক্ত নুন খেয়ে কারো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। বরং গরমের দেশে কিছু বেশী নুন খাওয়াই

ভালো। তবে মূত্রদোষ থাকলে আর শোথ হলে তখন নুন খাওয়া ছাড়তে হয়।

আহারের শেষকালে আমরা একটু টক্ বা চাট্নি খাই। এও খুব ভালো ব্যবস্থা। অম্ল আস্বাদের দ্বারা ক্ষারীয় লাল রসের ক্ষরণ স্থগিত ক'রে দেওয়া হয়, অর্থাৎ অতঃপর আর লালারস ক্ষরিত হবার প্রয়োজন নেই। শেষকালে টক খাওয়া তাই ভালো, এবং তা বেশী পরিমাণে খাওয়াও যায় না। দাঁত শিরশির করলে অনেকে টক খেতেই পারে না।

কিন্তু প্রধান দোষ করি আমরা ঝাল খাওয়াতে। ঝাল জিনিসটা ঠিক আস্বাদের ব্যাপার নয়, শুধুই রসনার উত্তেজনা এবং তাতেই আমরা অভ্যস্ত হই বলে সকল খাদ্যেই এটি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। ডালে, ঝোলে, তরকারিতে, অম্বলে সব জিনিসেই কিছু ঝাল থাকা চাই। ঝাল মানে লংকার ঝাল। কাঁচা লংকার রসে কিছু আস্বাদ আছে বটে, কিন্তু শুক্নো লংকাতে ঝাল ছাড়া আর কিছুই নেই। আমাদের তাই প্রয়োজন। গোলমরিচ, সরিষা প্রভৃতিতেও কিছু ঝাল আছে, কিন্তু তাতে কুলায় না। যাতে লংকার ঝাল নেই সে হলো আঝালা জিনিস, তার কোনো স্বাদই নেই, তেমন জিনিস খাওয়াই বৃথা। মাংসে তো ঝাল চাই-ই, লংকা দিয়ে তা লাল গর্গরে হওয়া চাই, নতুবা তা অখাদ্য। এমন রুচি দুনিয়ার অন্য কোনো দেশে নেই, আছে কেবল আমাদের দেশে, বেশীর ভাগ মাদ্রাজে ও বাংলায়। আমাদের এটি অভ্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়, বাল্যাবধি এতেই আমরা আগাগোড়া অভ্যস্ত হয়েছি।

অথচ এতে সব জিনিসেরই স্বাভাবিক আস্বাদ নষ্ট হয়ে যায়, ঝালটাই থাকে সর্বপ্রধান হয়ে। আর কত যে রোগ কেবল এর কারণেই জন্মায়। লংকার গুঁড়ো কখনো গলে না, অন্ত্রনালীর যেখানে

যায় সেখানেই তার ঝিল্লিগাত্রে লেগে থেকে, প্রদাহ জন্মাতে থাকে, গোড়া থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। এরই কারণে জন্মায় ডিসপেপ্‌সিয়া, গ্যাসট্রিক আল্‌সার, অন্ত্রক্ষত, উদরাময়, ক্রনিক আমাশা, অর্শরোগ এবং আরো কত কিছু। আর লংকা খাওয়া ছাড়লেই স্বাস্থ্য ভালো থাকে। এ কথা সত্য কিনা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা প্রত্যেকে নিজেরাই পেতে পারি, যদি মাত্র সাত দিন আমরা কোনো জিনিসেই কিছুমাত্র লংকার ঝাল না দিয়ে খেয়ে দেখি। প্রথমটায় তা মুখরোচক হবে না,—কিন্তু শরীরের কতটা পরিবর্তন হলো, কতটা সুস্থ বোধ করছি, তা সাতদিনেই বোঝা যাবে। শুধু রসনাতৃপ্তির লোভে লংকার ঝাল খেয়ে আমরা শরীরের সমূহ অনিষ্ট করি। প্রচুর ঝাল খেয়েও যাদের ঝাল লাগে না, তাদের ভিতরকার অনিষ্ট যে তাতে কিছু কম হয় সে কথা মোটেই নয়।

আহারের শেষে আমরা কিছু মিষ্টি খাই। এ নিয়ম প্রায় সকল দেশেই আছে। প্রাত্যহিক আহারের এবং জীবনেরও শেষ আস্বাদটি মিষ্টি হোক, এটি সকলেই চায়। কিন্তু তাই বলে মিষ্টি বেশী খাওয়া উচিত নয়। বেশী মিষ্টি খেলে তার আবার অগুণ আছে, লিভার এবং প্যাংক্রিয়াস প্রভৃতি যন্ত্রগুলির উপর তাতে অত্যাচার করা হয়। তার ফলে দেখা যায় ডিসপেপসিয়া, ডায়েবিটিস, দেহের স্থূলতা বৃদ্ধি, রক্তের চাপবৃদ্ধি। মিষ্টি নিয়মিত খেলেও কম ক'রে খাওয়াই ভালো।

পেটের দোষ

পেটের দোষ আধুনিক যুগের সভ্য জগতের প্রায় সকলেরই। আগেকার যুগে, এমন কি দুই এক শতাব্দী আগে পর্যন্ত এর সম্বন্ধে মানুষদের নালিশ এমন ব্যাপকভাবে শোনা যায় নি। এখনকার দিনে শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে এবং বিশেষ ক'রে শহরের লোকদের মধ্যে শতকরা নব্বুই জনের মুখে এই নালিশটি শোনা যায়, এ কথা বললে খুব অত্যুক্তি করা হবে না। কিন্তু যারা অসভ্য অশিক্ষিত মানুষ, আর বিশেষত যারা পাড়াগাঁয়ে থাকে, তাদের সম্বন্ধে পেটের দোষের কথা এখনও ক্বচিৎ শোনা যাবে। পল্লীগ্রামের ভদ্রলোকদের মধ্যেও এই নালিশ অপেক্ষাকৃত কম।

আধুনিক যুগের জীবনযাত্রাই এর জন্য দায়ী। আগেকার যুগে লোকে শৌচে যেতো অন্ততপক্ষে দুই তিনবার তো বটেই। তিনবার যাওয়াই ছিল সাধারণ নিয়ম। আর সেই অনুপাতে তারা খেতোও প্রচুর। এবং তাদের সে সব খাদ্যও এখনকার মতো ছিল না। তারা ঢেঁকিছাঁটা কুঁড়োলাগা মোটা চালই খেতো, যাঁতায় ভাঙা ভুষিসমেত লাল আটা খেতো, মুড়ি চিঁড়াও যথেষ্ট খেতো, কাঁচা জিনিস অনেক কিছু খেতো, এবং গরু মহিষের খাঁটী দুধও পান করতো যথেষ্ট। কিন্তু এখনকার দিনে সবই পাল্‌টে গেছে। অতি মিহি কলে-ছাঁটা চালের গলা-গলা ভাত ছাড়া আমাদের রোচে না, চায়ের সঙ্গে মিহি ময়দার পাঁউরুটি খাওয়া চাই, তার উপর অর্থের সচ্ছলতা থাকলে মাছ, মাংস ও মিষ্টান্ন। কিন্তু দুধ টুধ-নয়। তরকারির মধ্যে শাক-সব্জি নয়, শুধুই আলু আর পটোল। সবই ছিবড়াশূন্য, শুধু শাঁসযুক্ত, মার্জিত মোলায়েম খাদ্যবস্তু।

আর আজকাল আমাদের দৈনিক একবারের বেশী শৌচে যাবার ফুরসত নেই, সুযোগও নেই। তাই একবার করে মাত্র যাওয়াই সকলের দিনান্তের অভ্যাস হয়ে যায়। খাদ্যের মধ্যে বর্জনীয় বস্তুর অভাবে তার বেশী যাবার প্রয়োজনও হয় না। অথচ এদিকে আশানুরূপ মলত্যাগ না হওয়াতে শরীরও সুস্থ হয় না, মনও সুস্থির হয় না। সারাটা দিন শরীর ম্যাজ্‌ম্যাজ্‌ ও খুঁতখুঁত করতে থাকে, দেহে মনে স্ফূর্তি আসে না, পেট এঁটে থাকে বলে খেতে ইচ্ছা হয় না। সর্বাঙ্গে আড়ষ্টতা অনুভব হতে থাকে। মোটের উপর সর্বদাই একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাব, আর ঐ কথাই ঘুরে ফিরে সর্বক্ষণ মনকে ক্লিষ্ট করে। সবাই বোঝে যে, পেটের দোষই এর কারণ, যেহেতু স্পষ্টই দেখা যায় যেদিন জোলাপ নিয়ে কোষ্ঠ পরিষ্কার হলো, সেদিন আপনা থেকেই দেহে মনে স্ফূর্তি পাওয়া গেল, বেশ খেতেও পারা গেল, সকল বিষয়েই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হতে থাকল।

এমন কোষ্ঠবদ্ধতা আদৌ আসতেই পারে না, যদি বাল্যকাল হতে নিয়মিত সময়ে অন্তত দুইবার করে মলত্যাগ অভ্যাস করানো হয়, যদি ছিবড়া, চোকল ও সেলুলোজযুক্ত খাদ্য খেতে শেখানো হয়, এবং যদি দৈনিক কিছু পরিশ্রম ও ব্যায়াম অভ্যাস করানো হয়। বাল্যকাল থেকে পিতামাতা এবিষয়ে অবহিত হলে পুত্রকন্যারা বড়ো হয়ে তার সুফল ভোগ করে। তারা ছেলেবেলার অভ্যাসটাই বজায় রাখে, সুতরাং পরিণত বয়সে তাদের ঐ সকল কষ্টে ভুগতে হয় না।

কিন্তু যাদের অভ্যাসের দোষে বা খাবার দোষে বা অন্য কারণে কোষ্ঠবদ্ধতা এসে গেছে, তাদের পক্ষে প্রতিকারের কি উপায় হতে পারে, উপস্থিত তাই আমাদের বিবেচ্য।

প্রথমত খাদ্যের প্রকরণ বদলানো দরকার। প্রচুর সারযুক্ত ও ছিবড়াযুক্ত খাদ্য আমাদের খেতে হবে। কলেছাঁটা চালের বদলে

ঢেঁকিছাঁটা চালের ভাত, এবং সাদা পাউরুটির বদলে চোকলযুক্ত লাল আটার হাতে-গড়া রুটি বা পরোটা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আর বিশেষ করে শাক-সব্জি ও আনাজ তরকারি খাওয়া অভ্যাস করতে হবে। বিভিন্ন ঋতুতে নানা রকমের শাক মেলে। শাতের সময় বাঁধাকপি, শুঁটি, বরবটি, গাজর, শালগম প্রভৃতি মেলে, অন্যান্য সময়ে ডাঁটা, কচু, ভেণ্ডি, ডুমুর, বেগুন, ঝিঙা, মূলা প্রভৃতি অনেক তরকারি মেলে। ভাতের পরিমাণ কমিয়ে তারই পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। মাছ, মাংস আমরা কতটুকুই বা খাই, কিন্তু তা ছাড়াও কিছু দুধ বা দই খাবার ব্যবস্থা করা উচিত।

দ্বিতীয়ত অম্লগুণযুক্ত কিছু ফল খেতে হয়। বেল, আম, আনারস, কমলালেবু, বাতাবি ও অন্যান্য লেবু, পেয়ারা, আপেল, ন্যাসপাতি, কলা, পেঁপে, ফুঁটি এবং কাঁচার মধ্যে শসা, শাঁকআলু এবং শুকনো ফলের মধ্যে খেজুর, মোনক্কা, খোবানি, কিসমিস প্রভৃতি অনেক কিছু ফলের নাম করা যায়। ফলগুলি সকালে কিংবা সন্ধ্যায় আলাদা ভাবেও খাওয়া যায়, কিংবা ভাতের সঙ্গেও খাওয়া যায়। ফলের অম্লরস ভিতরের অম্লত্ব বাড়ায় না, এবং মলের পরিমাণ বাড়াতে তা সাহায্য করে। কোনো ফল না জুটলেও অন্তত কলা নিশ্চয় জুটতে পারে।

তৃতীয়ত, জল খাওয়া বাড়ানো উচিত। যাদের হার্টের দোষ আছে কিংবা যারা অসুস্থ তাদের পক্ষে নয়, কিন্তু তারা ভিন্ন সকলেই একটু বেশী পরিমাণে জল খাওয়া অভ্যাস করতে পারে। বিশেষত প্রাতে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে এক গ্লাস জল পান করা, যাকে উষাপান বলে, কোষ্ঠ পরিষ্কারের পক্ষে খুবই উপকারী। এতে অন্ত্রাদি ধৌত হয়ে যায় এবং হজমশক্তিও বাড়ায়।

চতুর্থত দেহের পরিশ্রম হওয়া এবং যথেষ্ট অঙ্গ চালনা হওয়া দরকার। দেহকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রাখলে অন্ত্রাদির মাংসপেশীগুলি

নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে, তাতে মলভাণ্ডের উত্তমরূপ চালনা হয় না। যাদের বসে বসে কাজ, দেহের পরিশ্রম তেমন করতে হয় না, তাদের পক্ষে কিছু ব্যায়াম অভ্যাস করাই উচিত। বিশেষত পেটের মাংসপেশীগুলির যাতে চালনা হয় সেইরূপ ব্যায়াম করা উচিত। এর জন্য আমাদের দেশে গরুড়াসন প্রভৃতি নানারকম আসনের প্রণালী আছে, সেগুলি অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে শিখে নেওয়া উচিত। পেটে দলাই মলাই বা ম্যাসাজ করাও উত্তম ব্যবস্থা, যদি তেমন অভিজ্ঞ লোক মেলে। অবশ্য এটি সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না, কিন্তু ব্যায়াম ও আসন করা সকলের পক্ষেই সম্ভব। প্রাণায়ামের দ্বারা প্রলম্বিতভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়াও এ পক্ষে উপকারী। তাতেও খুব কাজ হয়।

অতঃপর জোলাপের কথা। যাদের কোনোমতে কোষ্ঠ চালনা হয় না, তাদের প্রায়ই কিছু কৃত্রিম উপায়ের সাহায্য নিতে বাধ্য হতে হয়। অনেকে প্রত্যহ বেল খেতে উপদেশ দেন, পাকা বেল না পাওয়া গেলে কাঁচা বেলই প্রত্যহ সিদ্ধ করে খাওয়া। কিন্তু তাও বৎসরের সকল সময়ে পাওয়া যায় না। এবং কিছুকাল খেতে খেতে তাও অভ্যাস হয়ে যায়। এ পক্ষে প্রত্যহ কিছু পরিমাণে ইসবগুল খাওয়া বিশেষ উপকারী। কেউ খান ইসবগুল, কেউ খান তার ভুষি, একই কথা; অবশ্য, এও কিছুকাল পরে অভ্যাস হয়ে যায়, তখন এর মাত্রা বাড়াতে হয়। এর বিশেষ গুণ এই যে, এটি ঔষধ পর্যায়ের মধ্যে পড়ে না, এর কোনো রাসায়নিক ক্রিয়া নেই, শুধুই পেটের মধ্যে জল পেয়ে অনেকটা ফুলে ওঠে এবং তারই চাপে মলকে নরম ক'রে দেয়। ইসবগুল খেতে হয় শয়নের পূর্বে, কিছু গরম দুধ বা জলের সঙ্গে। প্রথমে এক চামচ থেকে শুরু করা যায়।

দ্বিতীয় উপায়, প্যারাফিন তৈল বা তার থেকে প্রস্তুত কিছু খাওয়া, যেমন ক্রীমাফিন, আগারল, পেট্রোলাগার ইত্যাদি। এতে মলকে নরম

ও পিচ্ছিল ক'রে দিয়ে নির্গমের পক্ষে সাহায্য করে। প্যারাফিন তৈল এক আউন্স থেকে দুই আউন্স পর্যন্ত খাওয়া চলে। এও রাত্রে শয়নের পূর্বে খাওয়া উচিত। অবশ্য এও কিছুকাল পরে অভ্যাস হয়ে যাবে। অতএব সে স্থলে এক উপায় করা যেতে পারে। কিছুদিন প্যারাফিন খাওয়া গেল, আবার কিছুদিন তা বদল ক'রে ইসবগুল খাওয়া গেল, এরূপ করলে কোনোটাই অভ্যাস হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

জোলাপের বড়ি ও ঔষধাদিতে এখনকার বাজার ছেয়ে আছে। সবগুলিই কিছু-না-কিছু বিক্রিও হয়, অর্থাৎ লোকে নিশ্চয়ই তা ব্যবহার করে। কিন্তু ঐ সকল ওষুধের জোলাপ নিয়মিতভাবে ব্যবহার করা কখনই উচিত নয়। ওতে স্বাভাবিক দৈহিক ক্রিয়াকে আরো বেশী বিকৃত ক'রে দেয়। কেউ কেউ সপ্তাহে একবার ক'রে প্রাতঃকালে ফ্রুটসল্ট জাতীয় জিনিস গরম জলের সহিত মিশিয়ে খেয়ে থাকেন। তাতে অল্প সময়ের মধ্যে পেট ধোলাই ক'রে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু যেটাই খাওয়া হোক, সবই ঔষধাক্ত, সবের মধ্যেই ম্যাগসাল্ফ-প্রভৃতি জিনিস আছে। এগুলি মাঝে মাঝে এক-আধবার খাওয়া যেতে পারে, নিয়মিত খাওয়া ঠিক নয়। যাঁদের এরূপ অভ্যাস আছে তাঁরা ঐ সকল পেটেন্ট সল্টের বদলে সাধারণ লবণ বা রান্নার নুনই ব্যবহার ক'রে দেখবেন, তাতেও চমৎকার কাজ হবে। দুই চামচ বা তিন চামচ নুন গুলে নেবেন বড়ো এক গ্লাস গরম জলে, এবং সকালে খালি পেটে সবটুকু পান করে নেবেন। এতে এক ঘণ্টার মধ্যেই বেগ এসে পেট পরিষ্কার হয়ে যাবে। এতে অন্য কিছু পেটেন্ট দাওয়াই পয়সা দিয়ে কিনে খেতেও হবে না, এবং দেহযন্ত্রকে উৎপীড়িতও করা হবে না। সকলেই এই সাধারণ নুনের জোলাপ নিতে পারে, কেবল রক্তচাপ বেশী থাকলে কিম্বা কিড্‌নির দোষ থাকলে সেখানে এটি চলবে না।

যাদের কোষ্ঠবদ্ধতা অত্যন্ত বেশী, কোনোরূপ জোলাপেই মনঃপুত কাজ হয় না, তাদের পক্ষে জোলাপের বদলে এনিমা বা ডুস নেওয়াই ভালো। কোষ্ঠবদ্ধতার দরুন পেটে কষ্ট হতে থাকলে মাঝে মাঝে এনিমা নেওয়াতে কোনো ক্ষতি নেই। এনিমা নেওয়া মানে মলভাণ্ড ও নিম্ন অন্ত্রকে ধুয়ে সাফ ক'রে নেওয়া। বেশা মাত্রায় নয়, খানিকটা কুসুম-কুসুম গরম জল নির্মল মলদ্বার দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে হবে শোয়া অবস্থাতে, তাতে তৎক্ষণাৎ বেগ এসে নিম্ন অন্ত্র সাফ হয়ে যাবে। তবে এই প্রক্রিয়াটি নিয়মিত ভাবে অভ্যাস করা উচিত নয়। মাঝে মাঝে দরকার হলে এর সাহায্য নেওয়া চলতে পারে।

কিন্তু সবচেয়ে প্রধান কথা এই যে, প্রকৃত কোষ্ঠবদ্ধতা কিনা সেটা আগে জানা দরকার। অনেকেই বলে বটে কোষ্ঠবদ্ধতার কথা, কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই প্রকৃতপক্ষে তা হয়তো নয়। ওটি তাদের মনের ভুল। পল্লীগ্রামে যারা মুক্ত স্থানে মলত্যাগ করে, স্বচক্ষে দেখতে পায় প্রাত্যহিক মলের কতটা পরিমাণ। কিন্তু শহরে অন্ধকার ড্রেন-পায়খানাতে বসে যারা মলত্যাগ করে,তারা চোখে কিছু দেখে না, কেবল অনুভবেই বোঝে। কিন্তু অনুভব অনেক সময়েই মিথ্যা হয়, তার দ্বারা পরিমাণ বোঝা ভুল হয়। তাই কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়ে গেলেও মন খুঁত-খুঁত করতে থাকে, শেষে প্রাত্যহিক কোষ্ঠবদ্ধতা সম্বন্ধে বদ্ধমূল ধারণা দাঁড়িয়ে যায়। আরো এক কথা, প্রত্যহ যে প্রচুর পরিমাণে মলত্যাগ করাই চাই এমন স্বাভাবিক নিয়ম নয়। দুই তিন দিনের মল জমলে একদিন হয়তো অনেক মলত্যাগ হয়ে যাবে, তারপর দুই তিন দিন কম কম হতে থাকবে, এই হলো স্বাভাবিক নিয়ম। প্রত্যহ প্রচুর মলত্যাগ চাইলে তা অস্বাভাবিক জিনিস চাওয়া হবে, বিশেষত আধুনিক খাদ্য ব্যবস্থা অনুসারে। সুতরাং আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক নিয়মে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আর প্রত্যাশা নিয়ে বহুক্ষণ পায়খানাতে বসে থাকা,

সেটাও খুব খারাপ অভ্যাস। তাও আসে মনের দুর্বলতা থেকে। মনের এই সকল ভ্রান্তি ও দুর্বলতা সংশোধন করে নেওয়া উচিত। এই কথাই আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, কোষ্ঠবদ্ধতা হলেও কোনো ক্ষতি নেই, যদি তাতে শরীর সুস্থ থাকে। আমি সুস্থ আছি কিনা তাই হলো প্রধান কথা। আমার প্রচুর মলত্যাগ হচ্ছে কিনা সেটা গৌণ ও অবান্তর কথা।

চোখের দোষ

চোখের দোষ অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তির অবনতি প্রায়ই চোখের নিজের দোষে হয় না, তা হয় অন্য কারণে। কতক দোষ আসে বাইরের থেকে আর কতক দোষ জন্মায় চোখের সমুচিত পুষ্টির বা খাদ্যের অভাবে। বাইরের থেকে যদি কোনো রোগের আক্রমণ আসে তাকে বলতে হয় আকস্মিক দুর্ঘটনা বা নিয়তি। আগের থেকে তা জানাও যায় না, বা নিবারণ করাও যায় না। কিন্তু পুষ্টির অভাব থেকে, অর্থাৎ ওর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু ও তন্তুগুলির জন্য বিশেষ যে সব খাদ্যবস্তু ওকে সরবরাহ করা দরকার তার অভাবে যে দোষগুলি হতে দেখা যায়, তাকে আমরা অবশ্যই নিবারণ করতে পারি, এবং আরোগ্যও করতে পারি, ঐ প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তুগুলি যথোচিতভাবে প্রয়োগ করে।

আমাদের মধ্যে অনেকের একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, দৃষ্টি-শক্তির উপর বেশী চাপ দিলে, চোখকে অনবরত খাটাতে থাকলে, বেশী পড়াশোনা করা বা সেলাই করা প্রভৃতি নিবিষ্ট নিরীক্ষণের কাজ নিয়ে থাকলে তার থেকেই চোখ খারাপ হয়। এ কথার মধ্যে সামান্য কিছু সত্যতা থাকলেও চোখ খারাপের প্রকৃত কারণ প্রায়ই তা নয়। চোখের সমুচিত পুষ্টির অভাবই তার দৃষ্টিশক্তি বিগ্‌ড়ে যাবার মূল কারণ। একথা পূর্বে আমরা জানতাম না, কিন্তু ভিটামিন প্রভৃতি আবিষ্কারের পর এবং নানাবিধ পরীক্ষাদির পর এই কথাই এখন সত্য বলে জানা গেছে। বস্তুত একটু ভাবলেই বোঝা যাবে যে চোখের সৃষ্টি হয়েছে দেখার জন্য, তাকে নিত্যই দেখার কাজ করতে হবে, এবং তাতেই চোখ যন্ত্রটি স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থায় থাকবে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে চোখ অবশ্য ক্লান্ত হবে, একথা নিশ্চয়, কিন্তু তাকে তখন

কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিলেই আবার সে পূর্বের মতো সুস্থ হবে। এইরূপই হওয়া উচিত স্বাভাবিক নিয়ম। চোখ হল এক অতি উৎকৃষ্ট ক্যামেরা যন্ত্র। যতই সূক্ষ্ম ফোটো নেওয়া হোক, তাতে ক্যামেরা কখনো খারাপ হয় না। তবে আমাদের ক্যামেরাই বা কেন তাতে খারাপ হবে? যে কারিগর আমাদের এই অপূর্ব ক্যামেরা-যন্ত্র গড়েছে, সে এমন কাঁচা কারিগর নয় যে অতিরিক্ত ব্যবহারে যন্ত্র বিগ্‌ড়ে যাবে। বস্তুত পুষ্টি না পেলেই চোখ খারাপ হয়, এবং তা আমাদেরই দোষে।

চোখের পুষ্টির জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় খাদ্য হলো প্রোটিন। ছোটকাল থেকে যথোচিত মাত্রায় প্রোটিনের অভাবে চোখ খারাপ হতে শুরু হয়, এবং বারো বছর বয়সের মধ্যে তা বেশ জানতে পারা যায়। তার কোনো প্রতিকার না করলে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত তার মাত্রা আরো একটু ক'রে বাড়তে থাকে। যাদের চোখ খারাপ তাদের মধ্যে সন্ধান করলেই জানা যাবে যে তারা ছেলেবেলা থেকে প্রচুর দুধ পায়নি এবং মাছ মাংস প্রভৃতিও খুব কম খায়। সময় থাকতে তাদের যদি প্রোটিন খাদ্য কিছু বেশী পরিমাণে খাবার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে দৃষ্টিশক্তির খুব বেশী উন্নতি না হলেও অবনতি হওয়া থেমে গেছে। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে, মাছের মুড়ো খেলে আর গুগ্‌লি খেলে চোখের দৃষ্টি বাড়ে। তার মানে আর কিছুই নয়, ঐগুলির নিয়মিত ব্যবহারে প্রোটিন খাওয়ার মাত্রা বেড়ে যায়, তাতেই দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হয়।

প্রোটিনের অভাবে যে বাস্তবিকই চোখ নষ্ট হতে পারে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে গত মহাযুদ্ধের সময়। জাপানীরা যখন সিঙ্গাপুর দখল করলে, তখন তারা অনেক লোককে বহুকালের জন্য ক্যাম্পে জড়ো করে রেখেছিল। তাদের খেতে দেওয়া হতো ভাত তরকারি, কিন্তু মাছ মাংস বর্জিত, এবং দুধও তারা পেতো না। তার ফলে দেখা

গেল যে ঐ সকল ব্যক্তির অনেকেরই চোখ খারাপ হলো। তাদের দৃষ্টি-শক্তি কমে গেল এবং নানারকম চক্ষুরোগে তারা আক্রান্ত হতে লাগল।

আজকাল আমাদের দেশে স্কুলে পড়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকেরই চোখ খারাপ আছে দেখা যায়। পাশ্চাত্ত্য দেশে এটি এত বেশী নেই, রাশিয়াতে খুবই কম। ছেলেমেয়েরা কাছের জিনিস বেশ দেখে কিন্তু দূরের জিনিস দেখতে পায় না। বই পড়বার সময় খুব কাছে এনে পড়ে, ক্লাসে বসে বোর্ডের লেখা পড়তে পারে না। রাস্তার ওপারে কি আছে, এপার থেকে তা দেখতে পায় না। এই নিকটবদ্ধ দৃষ্টিকে বলে মাইওপিয়া (myopia)। এ অবস্থা হয় অক্ষিগোলক একটু লম্বাটে হয়ে যাওয়াতে, সামনে পিছনে তার ব্যাস বেড়ে যায়। সেই কারণে দূরের ফোকাস অক্ষিপটে ঠিক জায়গাতে পড়ে না, একটু সামনে পড়ে। এ দোষটি বাল্যাবস্থাতেই দেখা দেয়, কিন্তু পরিণত বয়সে তার চেয়ে বেশী বাড়ে না, যেমন ছিল তেমনি থেকে যায়। অনেকের মতে সংকীর্ণ ঘরে বাস করাতে এবং ঝুঁকে বসে লেখাপড়া করাতে এটি হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পোষ্টাই খাদ্যের অভাবই এর কারণ। আগের থেকে পোষ্টাই খাদ্য খেতে থাকলে এ-দোষ জন্মাতে পারে না। দোষ একবার জন্মে গেলে তখন চশমা দিয়ে তাকে শোধরাতে হয়।

কিন্তু চশমাতে দোষ শোধরালেও বিকৃতিটুকু সারে না। কাজেই চিরদিনই চশমা ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে যে এ-দোষ সারিয়ে দেওয়া যায় ভিটামিনের দ্বারা। কয়েকজন ফরাসী ডাক্তার সম্প্রতি এই কথা বলেছেন। তাঁরা বলেন যে, অক্ষিগোলকের তন্তুগুলির অপুষ্টি ও দুর্বলতা থেকেই তার ঐ ব্যাস বেড়ে যায়। ভিটামিন-'ই' উচিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে থাকলে তন্তুগুলির দুর্বলতা ঘুচে গিয়ে অক্ষিগোলক আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে। তাঁদের নির্দেশ এই যে

ভিটামিন-'ই' ৫০ থেকে ১০০ মিলিগ্রাম মাত্রায় প্রত্যহ একবার ক'রে তিনমাস যাবৎ খাওয়াতে হবে, এবং কয়েক সপ্তাহ স্থগিত রেখে আবার তিনমাস ঐভাবে চলবে। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করলে মাইওপিয়া আরোগ্য হয়ে যাবে, ভবিষ্যতে চশমা ব্যবহার করতে হবে না।

ভিটামিন-'ই' স্বাভাবিক খাদ্যের মধ্যে থাকে গমের অঙ্কুরে, সীম, বীন ও বরবটিতে, কলাইশুঁটি ও শালগমে, মাংসের মেটুলিতে এবং বাদাম পেস্তা প্রভৃতিতে। কিন্তু তা থাকে খুবই কম পরিমাণে। অতএব এখানে ডাক্তারি বড়ি আকারে ভিটামিন-'ই' খাওয়া প্রয়োজন। ভাজা-ভুজি খেলে রন্ধিত তেলের দ্বারা এই ভিটামিন নষ্ট হয়ে যেতে পারে, অতএব তেলে-ভাজা কিছু খাওয়া তখন নিষিদ্ধ করা উচিত।

শুধু ভিটামিন 'ই' নয়, অন্যান্য ভিটামিনও চোখের পক্ষে বিশেষ উপকারী। চোখ ভালো রাখতে সবচেয়ে বেশী দরকার ভিটামিন 'এ'। বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে একে বলা হয় চোখের দোষ নিবারণ করবার 'স্পেসিফিক'। এই ভিটামিনের একান্ত অভাবে চোখ একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যাদের চোখে নিত্য ঘা হয়, চিকিৎসাদি সত্ত্বেও সারতে চায় না,—কারো বা চোখের গোলক একেবারে শুকিয়ে গিয়ে অন্ধত্ব দেখা দেয়, কেউ বা অন্ধ না হলেও রাতকানা হয়, তাদের এই সকল অবস্থার মূল কারণ এই ভিটামিনের অভাব। সময় থাকতে যথেষ্ট মাত্রায় এই ভিটামিন প্রয়োগ করতে থাকলে সে চোখ সুস্থ হয়ে ওঠে। তবে ঐ সকল ক্ষেত্রে ভিটামিন 'এ' কেবল খেতে দিয়ে কিছু কাজ হয় না, তখন তা ইন্‌জেকশনের দ্বারা প্রয়োগ করতে হয়। এই ভিটামিন স্বভাবত মায়ের দুধের মধ্যে থাকে, গরুর দুধেও থাকে, সুতরাং যারা প্রচুর দুধ খেতে পায় তাদের পক্ষে এ জিনিসের অভাব হয় না। কিন্তু এখনকার দিনে কয়জনই বা তা সেরূপ পরিমাণে খেতে পাচ্ছে! সুতরাং অন্যান্য জিনিসের দ্বারা এর অভাব পূরণ করতে হয়। ভিটামিন-

'এ' প্রচুর মাত্রাতে থাকে কডলিভার তেলে ও হাঙ্গরের তেলে। আর থাকে ডিমে এবং গাজরে। ছেলেমেয়েদের তাই কিছু কডলিভার ও ডিম খাওয়ানো ভালো। শীতের সময় প্রত্যহ তাদের গাজর খেতে দেওয়া খুবই ভালো।

তদ্ভিন্ন চোখের পক্ষে উপকারী ভিটামিন-বি কম্প্লেক্স,—বিশেষত ওর অন্তর্গত রিবোফ্লেভিন বা ভিটামিন বি$_{২}$। যাদের চোখের পাতার গোড়ায় প্রায়ই ঘা হতে দেখা যায়, প্রায়ই পাতা ঝরে যেতে থাকে, চোখ জ্বালা করে, আলোর দিকে চাইতে কষ্ট হয়, যাদের চোখের কর্ণিয়া ঘোলাটে হয়ে থাকে—তাদের পক্ষে ঐ রিবোফ্লেভিন খুবই উপকারী। পরিণত বয়সেও এটি চোখ ভালো রাখার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে। এতে দৃষ্টিশক্তিকে সতেজ করে, এবং অনেক সময় চোখে ছানিপড়া নিবারণ করে। যাদের চোখে ছানিপড়ার কিছু সম্ভাবনা আছে তারা গোড়া থেকেই রিবোফ্লেভিন খেতে থাকলে ছানিপড়া নিবারিত হতে পারে। অবশ্য ছানি পড়তে একবার শুরু হয়ে গেলে তখন আর তাকে ঠেকিয়ে রাখা দুঃসাধ্য। কিন্তু সময় থাকতে ওর সাহায্য নিলে সুফল মিলতে পারে।

অতিরিক্ত তামাকের নেশা থাকলে তাতেও কারো কারো চোখে একরূপ দোষ জন্মায়। তারা মাঝে মাঝে চোখের সামনে কালো কালো দাগ দেখতে থাকে, কিছুক্ষণ বই পড়লে তাদের মাথা ধরে, আর কেউ কেউ লাল রং এবং সবুজ রং চিনতে পারে না। এমন হলে তাদের পক্ষে ভিটামিন বি$_{১২}$ বিশেষ উপকারী। অধিক মাত্রায় এই ভিটামিন বি$_{১২}$ কয়েকটি ইনজেকশন দিলেই ঐ সকল দোষ আরোগ্য হয়ে যায়। খাবার জিনিসের মধ্যে এই ভিটামিনটি মিলবে মাংসের মেটুলিতে এবং ডিমের হরিদ্রা অংশে।

এগুলি ব্যতীত ভিটামিন 'সি' কাজ করে চোখের লেন্সের উপর।

চোখের লেন্সের পক্ষে অক্সিজেন প্রয়োজন, এই ভিটামিন তা ওখানে পৌঁছে দেবার পক্ষে সাহায্য করে। চোখে ছানিপড়ার কারণ হলো লেন্সটি অনচ্ছ হয়ে যাওয়া ; এই ভিটামিনের দ্বারা তা নিবারিত হয়। এতদ্ভিন্ন গ্লোকোমা নামক রোগটি জন্মাতে পারে এই ভিটামিনের অভাবে। সুতরাং চোখ ভালো রাখতে ভিটামিন 'সি' নিশ্চয় প্রয়োজন। এই ভিটামিন আছে সকল প্রকার টাটকা ফলে, শাক-সব্জিতে, আমলকীতে এবং সকল রকমের লেবুতে।

ভিটামিন 'ডি' কম প্রয়োজনীয় নয়। এর অভাবেও ছানি পড়তে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে যে, মুরগির বাচ্চাদের খাদ্যে এই ভিটামিন আদৌ না থাকলে তাদের চোখের লেন্স ঘোলাটে হতে থাকে, এবং তখন এই ভিটামিন দিতে থাকলেই তা সেরে যায়।

ক্যালসিয়মের অভাবেও চোখের কয়েক প্রকার অনিষ্ট হতে দেখা যায়। চোখ অনবরত পিটপিট করতে থাকা, চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকা, অল্পে চোখ লাল হয়ে ওঠা, এই সব লক্ষণের অন্যতম কারণ হলেই ক্যালসিয়মের অভাব। ওষুধ হিসাবে ক্যালসিয়ম প্রয়োগ করতে থাকলে এই দোষগুলি সেরে যায়।

মোট কথা, আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, চোখ ভালো রাখতে হলে খাদ্যে ভিটামিন থাকা চাই। বিশেষ করে ছেলেমেয়েরা যাতে যথেষ্ট ভিটামিন পায়, যথেষ্ট প্রোটিন খাদ্য পায়, এবং কিছু দুধ খেতে পায়, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।